ত্বমসি মম

কমল দাস

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ৭৩

তমসি মম

দেবেশ কে

লেখিকার অন্যান্য বই

জানা অজানা

অমৃতস্য পুত্রী (অকাদেমি পুরস্কার বিজয়ী ১৩৮৯)

উত্তরে মেরু দক্ষিণে বন

কেক চকোলেট আর রূপকথা

এক

উর্মিলা নিউদিল্লী স্টেশনে এসে ঢুকল। এই রেল ষ্টেশনটা তার বড় প্রিয়। এখানে সুযোগ পেলেই এসে মাঝে মধ্যে বসে।

হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনের কথা মনে হলেই কেমন যেন ওর বুকটা ধরফড় করে ওঠে। ওখানে একটা যুদ্ধং দেহি ভাব। স্বভাবতই বাঙ্গালীরা নরম, সুশিক্ষিত, সভ্য ধরনের জাত। কিন্তু এখানে, মানে স্টেশন দুটাতে তার যথেষ্ট ব্যতিক্রম। অবশ্য তার একটা বড় কারণ, এখানে থাকে পাঁচ মিশেলি, তাই ঠিক একটা দেশের রীতির প্রাধান্য পাওয়া যায় না।

নিউদিল্লী স্টেশনটীর বিশেষত্ব, লোকের সংখ্যা কম। তাই শান্ত পরিবেশটা ততটা ক্ষুণ্ণ হয় না।

ক'দিনের জন্য উর্মিলা এসেছিল এখানে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে। জীবনটাও আরম্ভ করেছিল একটা ভাল স্কুলে, মানে পড়িয়ে। অল্পদিনের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে কলেজে লেকচারার হয়ে যায়। ওখানে পড়াতে পড়াতে থিসিস্ লিখে ডক্টরেট পেয়ে যায়।

তাই এখন ও ডঃ উর্মিলা রায়।

কলকাতাগামী ট্রেনের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসল। কলকাতা থেকে এসেছিল ক'দিনের জন্য। এখানে যখন ছিল, তখন কলকাতার কথা মনে হয়েছে। এখন আবার যেন কেমম পিছুটান বোধ করছে।

কলকাতারই বাসিন্দা ও। ওখানে থাকতেই ভালবাসে। তবে কাজের ছুতোয় কটা দিনের জন্য দিল্লী এসে ভালই লাগে।

নিউদিল্লীর টানা প্রশস্ত রাস্তা, খোলামেলা, চারিদিকে ফুলের কেয়ারী, সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা।

নিউদিল্লী বলতে গেলে মরুভূমিরই একটা অংশ। এখন কিন্তু তা মরূদ্যানে হয়েছে পরিণত। শুধু মানুষের চেষ্টায় মানুষের আকাঙ্ক্ষায়।

আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, যা ভগবান গড়েছিলেন শস্য শ্যামলা সুন্দর, তা হয়ে উঠেছে মরুভূমি। এও মানুষেরই চেষ্টায়, মানুষেরই আকাঙ্ক্ষায়।

এক এক সময় কেমন একটা বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে। এখন অবশ্য সর্বত্র একটা রব উঠেছে, মানুষকে বাঁচাতে হবে। মানুষকে দিতে হবে সব রকম সুবিধা।

মাতৃভূমিকে বাঁচাতে হবে—সে কথা কিন্তু এখনও বিশেষ শোনা যায় না। মা সন্তানের আগে সেই ভাবটা কবে যে আমাদের এই পোড়া দেশে আসবে, তা কে জানে।

জিনিস গুছিয়ে রেখে হোল্‌ডলটা খুলে বিছানা রিজার্ভ করা বার্থে বিছিয়ে বেড কভার দিয়ে ঢেকে দিল। চারজনের কামরা বাকি তিনটা নাম দেখে নিল। ওর ওপরের বাঙ্কে যাচ্ছে একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক। আর দুটীতে নাম দেখে মনে হোল একটা রাজস্থানী দম্পতি।

ও একটু আগে ভাগেই এসেছিল। ট্রেনটা 'ইন' করবার আগে আসাতেই একটা বেঞ্চে অল্প সময় বসতে পেরেছিল। বরাবরই ও বেশ একটু আগে আগে স্টেশনে আসতে ভালবাসে। গতানুগতিক জীবন ধারার চাইতে অনেকটা ব্যতিক্রম।

যা সহজলভ্য নয়, তাকে ত মনে করলেই পাওয়া যায় না। স্টেশনে আসার সুযোগ। এক জায়গার থেকে অন্য জায়গাতে যাওয়া, তাত সচরাচর ঘটে না।

তাই এই হঠাৎ পাওয়া বা স্বল্প পাওয়াকে সে একটু সময় নিয়ে আয়েসে উপভোগ করতে চায়।

তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীরা কেউ তখনও আসেনি। নিজের বিছানাতে পা তুলে আরাম করে বসে সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

বেশীর ভাগ লোকই ট্রেনে এসে ওঠে হন্তদন্ত হয়ে। হাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে। কেউ, বোধ হয়, ভেবেও দেখে না, কত কিছু তাদের অদেখা, অজানা থেকে যাচ্ছে।

তবে এটাও ঠিক যে ও হচ্ছে ভাবুক। ও ভাবতে ভালবাসে। বড় বড় চোখ দুটা ওর সব সময় সজাগ। বুঝি কিছু তার চোখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওর দেখা হোল না।

তবে এটা ও বোঝে, ওর মত যদি বেশীর ভাগ হোত, তবে উর্মির কত কিছু না বোঝা রয়ে যেত। বিচিত্র মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে বলেই ও সে দেখতে এত ভালবাসে।

দিল্লীতে যখনই আসে উর্মিলা, ওর বাঁধা থাকার জায়গা হচ্ছে দিদিভাইয়ের বাড়ীতে। তার প্রাণের বন্ধু মল্লিকার দিদি তন্নী। তন্নীর বিয়ে হয়েছে ডঃ সুহাস গুপ্তের সঙ্গে সরকারী ডাক্তার। থাকে নিউদিল্লীতে। উইলিংডন হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত।

সুহাস সত্যিকারের ডাক্তার। মানে অসুখ সারাবার ডাক্তার। উর্মিলার, ভাবলে অবাক লাগে, মল্লিকে বোধ হয় ও নিজের ভাই, অনুপের চাইতে ভালবাসে। না হলে, দিদিভাইয়ের কথা মনে হলে, প্রথমেই মনে আসে, সে মল্লির দিদি

মনেও হয় না তন্নীর ননদকে বিয়ে করেছে ওর ভাই। মনেও হয়না ওর ভাইয়ের স্ত্রীর দাদা হচ্ছে সুহাসদা। সুহাসদা দিদিভাইর স্বামী। সেই সম্পর্কেই যেন তাকে বেশী আপন মনে হয়।

মানুষের মন সত্যি এত সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বাঁধা যে, বাঁধা ধরা পথ দিয়ে সে যেতে চায় না। তাই বুঝি সমাজ শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল দিয়ে সবাইকে বাঁধতে চেষ্টা করেছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই ছিল শুভ ইচ্ছা। ধীরে ধীরে সেটা কখন যে শুভ ইচ্ছা থেকে ক্ষমতার লিপ্সাতে দাঁড়িয়েছে তা, বোধ হয়, সমাজের নেতারাও বুঝতে পারেনি।

তাইত, তা হয়ে দাড়িয়েছে সত্যিকারের প্রাণহীন চেতনাহীন, অনুভূতিহীন বন্ধন। এটাই হবে। এটাই একমাত্র করণীয়। তার থেকে একটু সরে দাঁড়ালে লোকে কি বলবে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। খুব সাজাগোজা একটা রাজস্থানী মেয়ে এসে ঢুকল। সঙ্গে একটা যুবক। বোঝা গেল স্বামীস্ত্রী। সাজসজ্জায় রাজস্থানের বিশেষ কোন ছাপ নেই। আজকালকার পোষাক যেমন

সর্বভারতীয়। স্যুট্ পরা ভদ্রলোক; মেয়েটা ছাপা সিল্কের সাড়ী পরা। কানে মুক্তোর দুল, গলায় মুক্তোর মালা, হাতে মুক্তোর বালার সঙ্গে কাঁচের চুরি।

উর্মিলার, কেন জানি, মনে হোল, গয়না পরে ট্রেনে না চলাই বোধ হয় ভাল। দিন কাল ত ভাল নয়।

এক মুহূর্তের জন্য কথাটা মনে এসে মিলিয়ে গেল।

কেন জানি, হঠাৎ মনে হোল, তার এই একক জীবনটা এখন পর্যন্ত ত বেশ ভালই কাটছে। মা-বাবা রয়েছেন। শম্ভুনাথও, মনে হয়, ওকে ভালবাসে। তার উপরে তার কাজ। তাছাড়া আছে মল্লি আর ইন্দ্রজিৎ। ফাঁক বলতে গেলে নেই।

ঝড়ের মত দিন কেটে যাচ্ছে। ঝড়ের ঝাপ্‌টাটা নেই। কিন্তু চঞ্চলতা, মানে ব্যস্ততাটা আছে পুরো মাত্রায়।

অনেকদিন পরে ট্রেনে বসে যেন মনে হচ্ছে, অঢেল সময় হাতে। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখল ধুতি-পরা চশমা-চোখে এসে ঢুকলেন অবশিষ্ট যাত্রীটি।

কোঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে হাত চালিয়ে একবার কামরাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলে উঠলেন, "আরে ডঃ রায় না? কি সৌভাগ্য," বলতে বলতে উর্মিলার পাশে এসে বসে পড়লেন।

উর্মিলারও চেনা মুখ দেখে ভাল লাগল। এতটা পথ যেতে হবে।

ও হেসে বলল, "ডঃ গাঙ্গুলী! বেশ হোল, এতটা পথ মুখ বুঁজে যেতে হবে না। আপনিও দেখছি, দু'দিন আগেই কলকাতা মুখো হলেন। পিছুটানটা বেশ জোর বলে মনে হচ্ছে।"

ডঃ উজ্জ্বল গাঙ্গুলী প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার। এই কন্‌ফারেন্সেই আলাপ।

নামটা শুনে উর্মিলা ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল। মনে হয়েছিল, বাবা-মা ছেলের চোখ দুটো দেখেই নাম রেখেছিলেন উজ্জ্বল। নজরে পড়ার মত উজ্জ্বল দুটো চোখ। তাছাড়া চেহারায় উজ্জ্বলতা আর কোথাও চোখে পড়ে না। রং যেমন সাদামাটা, চেহারাও তাই। চোখ

ছুটা কিন্তু সত্যি কাছে টানে। একবার তাকিয়ে আবার তাকাতে ইচ্ছা করে।

"তা, হেঁ, না মানে।"

"কি হোল, ডঃ গাঙ্গুলী? কথা খুঁজে পাচ্ছেন না? আমি জুগিয়ে দিচ্ছি—'এই দেখুন না, না আসতেই যাওয়ার তাড়া দিয়ে চিঠি এসে গেছে", দুষ্টুমী ভরা চোখে তাকাল উর্মিলা।

"কি আশ্চর্য! আপনি কি করে জানলেন? আপনি কি থট্ রিডিং করতে পারেন না কি?"

"মানে?"

"সত্যিই, তাড়া দিয়ে চিঠি এসেছে বোনটার। দু'জনের ত সংসার। এখানে আসার আগে বোনকে রেখে এসেছিলাম এক বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর বাড়ীতে। তাও মন টিকছে না। জানিয়েছে—রোজ চোখে জল আসে, ক্ষিদে পায় না, ঘুম পায় না, এই সব সিম্‌টম্। তাতেও আমি কান দিতাম না। আরও কটা দিন কাটিয়ে যেতাম। কিন্তু আরও একটা মারাত্মক সিমটমের কথা লিখেছে পড়ায় মন বস্‌ছে না। কয়েক মাসের মধ্যে ফাইন্যাল। অসুখে ভুগে অনেক পড়া নষ্ট হয়েছে। আমাদের দুজনের সংসার, আমি আর আমার ছোট বোনটা। আমার কথা ত হোল। আপনার তাড়ার কারণ?"

"আমার কোন তাড়া নেই। কোন কারণ নেই। আপনার দু'জনের সংসার। আমার তিন জনের। বাবা, মা, আমি। কেন জানি, মন চাইল ফিরে যেতে। মনে হোল, অনেক দিন কলকাতাকে ভাল করে দেখিনি। তাই গিয়ে দু'দিন দেখি। জানেন ডঃ গাঙ্গুলী, ওখানে থাকলে মনে হয় না। বেরিয়ে এসে মনে হয়।"

"আপনি ভাবুক প্রকৃতির। না, ডঃ রায়?

"আপনি কি করে জানলেন? আশ্চর্য! সবে ত ক'দিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা।"

"ডঃ রায়, আপনি খেয়াল করেন নি। আমি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে স্টেশনে এসেছি ও ট্রেনের সামনে দিয়ে কবার এদিক, ওদিক করেছি।

খেয়াল করেন নি। তখনি নজরে পড়েছে, আপনি সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু মন আপনার শুধু এখানে নয়।"

"আশ্চর্য! আপনাকে আমি দেখিনি। কিন্তু দাঁড়ান, আপনি কিন্তু কামরায় ঢুকে বললেন—আরে, ডঃ রায় না?"

"ওটাত একটা বলার কায়দা। এটা বললে কি ভাল হোত—ডঃ রায়, আপনাকে আমি অনেকক্ষণ নজর করছিলাম, আমি জানতাম, আমরা একসঙ্গে, মানে সহযাত্রী?"

"তা বটে।"

কখন যে হুইসেল বেজেছিল, উর্মিলার কানে যায়নি। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে ঠিক হয়ে বসল। তাকিয়ে দেখল ট্রেনটা প্রায় প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। অজস্র রুমাল নড়ছে। শেষ বিদায়ের নিশান হিসাবে।

দিদিভাই আসতে চেয়েছিল ওকে তুলে দিতে। তবে আরও একটা রুমাল বেশী নড়ত। ও বারণ করেছে;

"আমি অনেকটা আগে বেরুব। যাওয়ার পথে দু একটা জায়গাতে যাব।"

তাই তন্বী আর আসেনি। উর্মি বলতে পারেনি যে আমি সোজা স্টেশনে যাব। চুপটি করে এসে একা সেখানে কিছুক্ষণ না বসলে পারি না।

ট্রেনের ঘুম পাড়ানি ঝাঁকুনিতে হেলান দিয়ে উর্মিলার তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ গাড়ীটা থামাতে ওর তন্দ্রা গেল ছুটে। চোখ খুলে দেখল, মাঠের মাঝখানে থেমে গেছে ট্রেন। ক্লিয়ারেন্স পায়নি। তাই এই অচল অবস্থা।

দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-একটা বসতি রয়েছে। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। বড় তাড়াতাড়ি যেন দিনটা বিদায় নিল। মনে হোল, একটু আগেই ত দিনের আলো ছিল।

"কি ডঃ রায়, এত কি বাইরে তাকিয়ে দেখছেন? অন্ধকার ভেদ করে?"

হেসে উর্মিলা বলল, "সত্যি, আমাদের অন্ধকারে ঢাকা ভবিষ্যৎটা যদি একটু দেখতে পেতাম, কেমন হোত বলুন ত?"

"খুব কি ভাল হোত। বোধ হয়, না। ধরুন, আমি যদি দেখতে পাই, আমি দুমড়ে, মুচড়ে শেষ হব?"

"এটাও ত দেখতে পারেন যে, শেষ জীবনটা কাটতো আপনার সুখে, শান্তিতে, রাজাসনে?"

"তা দেখতে পেলে ত ভালই হোত, ডঃ রায়। তবে মুস্কিল হচ্ছে, কোনটা যে ভাগ্যে রয়েছে, তাত জানা নেই। তাই ভগবান দু-দলকেই আশায় আশায় রেখে দিচ্ছেন। যার ভাল হবে সে আশাতে কাটিয়েছে, আবার ভালটাও পেল। আর যে দুর্ভাগার খারাপটা হবে, সেও কিছুদিন আশাতে কাটাল।"

"ঠিক বলেছেন. ডঃ গাঙ্গুলী। আমি কিন্তু সেভাবে দেখিনি।"

অনেক্ষণ পরে উর্মিলা ফিরে তাকাল অন্যদিকে যাত্রীদের দিকে। দু'জনে ফিস ফিস করে কথা বলছে। মেয়েটাই বেশী বলছে। মনে হচ্ছে, দু'জনে দু'জনের সান্নিধ্য সত্যই উপভোগ করছে। বোধ হয়, বেশী দিন বিয়ে হয়নি। বোধ হয় টাকার গদির ওপর আছে বসে। ব্যবসার দায়-দায়িত্ব বেশীর ভাগ সিনিয়ারদের ওপর।

আবার, মনে হোল, বাইরে থেকে দেখে কি মানুষকে ধরা যায়, যখন অন্তর দুঃখে ভরা, মুখে হাসি মেখে লোকের সামনে কথা বলে যাচ্ছে? অন্যরা ভাবছে, কত সুখী।"

ফিরে তাকাল এবার উজ্জ্বল গাঙ্গুলীর দিকে। মন দিয়ে একটা সিরিয়াস বই পড়ছে। সাধারণতঃ, লোকে চলতি পথে 'আগাথা ক্রিষ্টি' বা সে ধরনের বই পড়ে। সময়টা ভাল কাটবে। ট্রেনের থেকে নামতে না নামতে পথে পড়া বই পথেই থেকে যাবে। মনে কিছু রেখাপাত করবে না। সাময়িক সময় কাটান।

তাই একটু অবাক হয়ে ডঃ গাঙ্গুলীর মন-দিয়ে পড়াটা লক্ষ্য করল। সময়ের মূল্য আছে এর কাছে।

সে মনে করে, তার কাছেও আছে। অনেক কিছু জানবার আছে

এই জগতে। সে ভালবাসে ভাবনার মধ্যে দিয়ে, দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জানতে। অবশ্য ও যথেষ্ট পড়াশুনাও করে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ন'টা বেজে গেছে। ট্রেনটা স্টেশনে থাকতেই বাকি দু'জন যাত্রী হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। ছেলেটা দিল দুটা থালির অর্ডার। ওদের খাওয়া দেখে, আর খাবারের গন্ধে উর্মিলার পেল খিদে।

দিদিভাই মস্ত এক টিফিন-কেরিয়ার ভর্তি নানা ধরণের খাবার অনেক বেশী বেশী সঙ্গে দিয়েছে, আর দিয়েছে এক ঝুড়ি ফল। তার সঙ্গে তিন বাক্স দিল্লীর মোহন হালুয়া।

"দেখ্ উর্মি, মিষ্টির বাক্সগুলো একটাও খুলবি না রাস্তায়। তিন বাড়ীর জন্য।"

আর দিয়েছে মল্লির জন্য একটা খুব সুন্দর সাড়ী।

"জানিস্ উর্মি, মল্লি আমাদের একটা মাত্র মেয়ে। বাবার জন্য ঐ সব করে। আমরা ত কিছু করি না। তাই, সব সময়, মনে হয়, ওকে, সামান্য হলেও যদি কিছু করতে পারি।"

"ঠিকই বলেছিস, দিদিভাই। মল্লি হচ্ছে আসছে কালের মেয়ে। আমরা ওর মত কি করে হব? আমরা যে একালের। আচ্ছা দিদিভাই, আমি একটা রাক্ষস? ঠিক আছে, ধরে নিলাম আমার খিদে রাক্ষসের মত। কিন্তু এত খাবার একটা রাক্ষসে ত পারবে না।"

"কেন? পথে আরও রাক্ষস জুটতে পারে। তুই ত শুধু ভাবুক নস্, সমান তালে কথুনি।"

"তা বটে। হার মানলাম।"

মনে হোল, দিদিভাইয়ের সত্যিই বুদ্ধি আছে। পথে পথিক ত ঠিকই জুটে গেছে।

"একটা কথা ছিল, স্যার।"

চমকে ডঃ গাঙ্গুলী বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন। তারপর হেসে ফেললেন, "কি ব্যাপার ডঃ রায়? সত্যি, আপনার সঙ্গটা বড় মধুর।"

কথাটা কানে যেতেই উর্মিলার যেন কেমন লজ্জার ভাব এলো।

ততক্ষণে উজ্জ্বল গাঙ্গুলীরও খেয়াল হোল, কথাটা ঠিক বলা হয়নি। হঠাৎ, কি করে জানি, মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল।

"না, মানে আমি বলতে চাইছিলাম…"।

"থাক, হয়েছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বাংলার দৌড়।"

এই বলে ঊর্মি আবহাওয়াটা হাল্কা করে দিল। ডঃ গাঙ্গুলীর সাহচর্য্যটা বেশ লাগছে। সেটাকে নষ্ট করতে চাইল না।

"শুনুন, শুধু পড়লে চলবে, প্রফেসর মশাই ? খেতে টেতে হবে না কি ?"

"ঠিকই ত। আমি এখনই দুজনের জন্য খাবার অর্ডার দিচ্ছি"—বলতে বলতে ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

"এই যা। কি অন্যায় ! এখন ত এর পরের স্টেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"

"তা কেন ? আমি হাত ধুয়ে এসে খাবার সাজাই দু'জনের জন্য। আর আপনি লক্ষ্মী ছেলের মত হাতমুখ ধুয়ে বসে পড়ুন।"

"মানে ?"

"মানে অতি পরিষ্কার। আমার দিদিভাই আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এক রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গী-সাথী আরও কেউ জুটে যাবে। সেই অনুপাতে খাবার দিয়ে দিয়েছেন। দেখছেন না, কি বিরাট টিফিন ক্যারিয়ার সঙ্গে।"

"তাই ত ! কিন্তু এত খাবার ওদিকে ত একটা ফলের ঝুড়ির মত লাগছে।"

"ওদিকে চোখ দেবেন না। পথে খোলা বারণ। তাছাড়া সঙ্গে তিন বাক্স হালুয়া মোহন আছে। একই হুকুম প্রযোজ্য পরের তিনটার জন্য।'

অবাক হয়ে ডঃ গাঙ্গুলী বললেন, "কিন্তু এত সব কেন ?"

"ওসব হচ্ছে কলকাতায় তিন বাড়ীতে দেবার জন্য। কি হোল ? উঠুন। ভয় পাবেন না। খাবারে কম পড়বে না।"

একটু হেসে ডঃ গাঙ্গুলী উঠে বাথরুমে গেলেন হাত ধুতে। খেতে খেতে ডঃ গাঙ্গুলী বললেন, "এক কথায় আমি কিন্তু খেতে বসে গেলাম। ঠিক সেই রকম সকালের ব্রেকফাস্ট কিন্তু ডাইনিং কারে আমি খাওয়াব।"

"বেশত। সে ত অনেক দেরী। তাই নিয়ে এখন থেকে মাথা না ঘামালেও চলবে। তাছাড়া, এক কথায় এমন রাজি না হয়ে আপনার কি উপায় ছিল বলুন? পরের ষ্টেশন আসতে ত বলতে গেলে, মাঝ রাত হোত।"

"তা ঠিকই বলেছেন। পড়তে পড়তে ঘড়িটা দেখতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া, আমার ত কোন দিদিভাই দিল্লীতে ছিল না যে সঙ্গে খাবার দেবে।" একটু হাসলেন প্রফেসার।

নানা কথার মধ্যে দু'জনের মধ্যে বেশ একটা হৃদ্যতা জমে উঠেছিল। তাই, বোধহয়, ঊর্মিলার জিজ্ঞাসা করতে আটকাল না, "আচ্ছা উজ্জ্বলবাবু আপনি বিয়ে করেন নি কেন? কাউকে মনের মত পাননি বলে?"

হাল্কা ভাবেই ঊর্মিলা কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল, যেমন আর দশ জনে করে থাকে। তাকিয়ে দেখল, ডঃ গাঙ্গুলীর মুখে যেন কেমন দুঃখের ভাব ফুটে উঠল। ঊর্মিলা কেমন অস্বস্তি বোধ করল।

একবার মনে হোল বলে—থাক গিয়ে। আপনার কোন উত্তর দিতে হবে না। কিন্তু মুখ দিয়ে কথাটা বের হোল না।

ততক্ষণে ডঃ গাঙ্গুলী বলে উঠলেন, "ডঃ রায়, কাউকে পছন্দ হয়নি বলে নয়। করা সম্ভব নয় বলে।"

কথাটা বড় অদ্ভুত ঠেকল কানে। ভাল চাকরী করে। স্বাস্থ্যবান পুরুষ। একটা মাত্র ছোট বোনের দায়িত্ব।

"কেন?"

"সে যে অনেক কথা, ডঃ রায়। তবে আপনার সহানুভূতিশীল মন। আপনি বুঝবেন। আমরা পূর্ববঙ্গের। মধ্যবিত্ত অবস্থার। বাবা স্কুলে পড়াতেন। বোনটা, আমার তুলনায় অনেকটা ছোট। শান্তির সংসার।

হঠাৎ আমাদের সব ছেড়ে চলে আসতে হয়। চারজনে আমরা এসে পৌঁছেছিলাম পশ্চিমবঙ্গে। সঙ্গে বিশেষ কিছু আনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু চট করেই বাবা একটা স্কুলে চাকরী পেয়ে গেলেন। আমি কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। বোনটা স্কুলে পড়ত। যখন ক্লাস টেন-এ উঠেছে, একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া হল। আমাদের অনুপাতে ছেলেটার চাকরীটা বেশী ভাল। আমিও এম, এ, তে ফার্স্ট ক্লাস পেলাম। সংসারটা যেন হেসে উঠল। লেকচারার শিপ্ একটা পেয়ে যাব। বাবা রিটায়ার করবেন। মার মুখে হাসি। তাঁর ছোট সংসারটা সুন্দর গোছান হয়ে উঠেছে। ফেলে আসা জিনিষের ও জমিজমার জন্য দুঃখ মন থেকে মুছে গেছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উর্মি আবার শুরু করলেন, "ঠিক সেই সময় বিনা মেঘে হোল বজ্রাঘাত। খবর এলো ভগ্নিপতি পুড়ে মারা গেছে। বোনের অবস্থাও এখন তখন। মা ত শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফেরার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারি নি। হতবুদ্ধি বাবাকে শুধু বলেছিলাম—মার মাথায় জল দাও। দরকার হলে ডাক্তার ডেকো। আমি চললাম। ট্রেনে চড়ে যখন গিয়ে পৌঁছালাম, তখনও বোনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে ভগ্নিপতির বাড়ীর বাড়ীর লোকেরা এসে পড়েছে। তাই সে দিকটা আর আমার কিছু করতে হয়নি। যমের সঙ্গে লড়াই করে বোনকে প্রাণে বাঁচালাম। কিন্তু সত্যি কি বাঁচালাম?"

আবার নীরব হয়ে গেলেন গাঙ্গুলী। একটু পরে আবার বলতে লাগলেন, "মুখের অর্দ্ধেকটা বিকৃত হয়ে গেছে। একটা পা টেনে চলতে হয়। ভগ্নপতি বিছানায় শুয়ে সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাতেই এই বিপর্য্যয়। মাকে নিয়ে বাবা চলে আসেন। ওখানে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে মাসের পর মাস আমরা থেকে বোনকে বাঁচিয়ে তুলি। বোনটা যেন কেমন হয়ে গেল। বাইরের লোকের সামনে একেবারে বেরুবে না—আমার এই বীভৎস চেহারা দেখে লোকে যে ভয় পাবে। যাই হোক করে বোনটাও শারীরিক সুস্থতা একরকম ফিরে পেল।

মা কিন্তু দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। চোখের সামনে মেয়ের এই কষ্ট যেন সহ্য করতে পারছিল না।"

"কি দিন গেছে আপনাদের ··, "বলতে বলতে উর্মিলার চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

সেদিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল গাঙ্গুলী যেন কেমন হয়ে গেলেন।

"না, থাক। আপনাকে কত দুঃখ দিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল—আপনি ভাবুক, সেনসিটিভ্, নরম মনের লোক এভাবে সব বলে আপনাকে দুঃখ দিলাম।"

"এমন করে কেন বলছেন? মনের দুঃখের কথা বলেইত মানুষ বাঁচে। আপনি বলুন"

"তাই বলি। আমার বলতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। ক্লাসে পড়াতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসি। ছেলেদের দিই ছুটি। ওরা অবশ্য ছুটি পেলেই খুশী।" একটু হাসলেন ডঃ গাঙ্গুলী।

"হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমি তার মধ্যেই বেশ কয়েকটা কলেজে চাকরীর চেষ্টা আরম্ভ করে দিয়েছি। বাবা রিটায়ার করেছেন। টাকা পয়সারও ত দরকার। ভাগ্যগুণে কলকাতাতে একটা কলেজে লেকচারারশিপ্ পেয়ে গেলাম। কলকাতাতে থাকার বন্দোবস্ত করে সবাইকে নিয়ে চলে এলাম। দিন গড়িয়ে চলতে লাগল। বোনটাকে ত একটু একটু বাড়ীতে পড়াতে আরম্ভ করলাম। কলেজ থেকে এসে ওকে নিয়েই সময় কাটাতাম। মাকে কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। বোনের মুখে যদি বা মাঝে মধ্যে হাসি ফোটাতে পারতাম, মার মুখে পারিনি। মা কি জিনিষ, তা সন্তান বোঝেনা।"

ডঃ উজ্জ্বল গাঙ্গুলী চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"ডঃ গাঙ্গুলী, হাতটা ধুয়ে আসুন গিয়ে।"

"ও হ্যাঁ। দিন, বাসন কটা আমি ধুয়ে আনি।"

"আপনি ধোবেন?"

"তাই ত ঠিক। আপনি খেতে দিলেন। আমি এটুকু করি"।

"তা বটে। সবাই মিলে মিশেই ত করা উচিত।"

সবকটা বাসন তুলে দিল ডঃ গাঙ্গুলীর হাতে। মনটা অন্যদিকে যাবে—এটাই বিশেষ করে ভেবে দু'জনেরই সবকটা তুলে দিল প্রফেসরের হাতে।

সত্যি, পৃথিবীতে মনে হয় দুঃখের ভাগটাই বেশী। শান্তির ভাগটা একেবারে ছিটে-ফোঁটা। কে যেন এক মহাপুরুষ বলেছিলেন—ভগবানের কাছে সব কিছু চাও, পেতে পার ; কিন্তু শান্তি চেয়ো না। তা দেবার ক্ষমতা, বোধ হয়, ওঁরও নেই।

"আসুন ডক্টর, মশলা নিন"।

"ডঃ রায়, আপনি খুব গোছাল, না? আমার বোনটার মত। কলকাতা থেকে আসার সময় এবভাবে সব সঙ্গে দিয়েছিল।

উর্মিলা শুধু একটু হাসল।

দুঃখের কথা তুলে ভদ্রলোকের মনে আঘাত দিতে এর-আর ইচ্ছে করল না।

"অনেক রাত হয়ে গেল। যান, ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। ওপাশের লোকেদের কিন্তু এখন মাঝ রাত।"

"সত্যি, বেশ রাত হয়ে গেল। শুভরাত্রি"।

উর্মিলা শুধু একটু হাসল। বাথরুম থেকে এসে, বাতি নিবিয়ে, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুই

হঠাৎ একটা চিৎকারের আওয়াজে উর্মির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ খুলেই ও লাফিয়ে উঠে বসল। চকচকে একটা ছোরা অন্ধকারে চোখের সামনে ঝলসে উঠল। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পিছন ফিরে আর হিন্দিতে বলছে, "যো ভি কুছ হায় নিকালো, সব নিকালো, জেবর রূপেয়া।"

আর অন্য বার্থের মেয়েটা একবার চিৎকার করেই, এক এক করে সব গয়না খুলে দিচ্ছে।

বাঙ্কের উপরেব স্বামী'র কিছু কববার উপায় নেই। ছোরা উঁচিয়ে সামনে যম দাঁড়িয়ে।

এক সেকেণ্ড।

এক সেকেণ্ড।

"প্রফেসর, আপনার বালিশের নিচের পিস্তলটা তাক করুন।"

প্রথম রাতে ডঃ গাঙ্গুলীর ভাল ঘুম না হওয়ায় মাঝরাতে ঘুমটা বেশ গাঢ হয়েছিল। তাই রাজস্থানী ভদ্রমহিলার চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গেনি। উর্মিব চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গেই চোখের নামনে ব্যাপারটা দেখেই পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে সময় লাগল না।

"দো হাতে উপব উঠাও ·· নেহিতো···।" ডঃ গাঙ্গুলীর গরুগম্ভীর গলার স্বরে কামরাটা যেন ডবলভাবে কেঁপে উঠল।

নিমেষে দেখা গেল, ছেলেটা ছোরা ফেলে দিয়ে হাত দুটা মাথার উপর দিয়ে দাঁড়াল। সবাই শুনল পরিষ্কার ইংরেজীতে জবাব, "প্লিজ্, স্যর, সেভ মি।"

উর্মি ইংরেজী শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল। সে কি! ছেলেটা ইংরেজী জানে। তবে কি শিক্ষিত?

যাই হোক্, ও এবার ইংবেজীতেই কথা বলল, "একদম চুপ করে যেমন আছ, দাঁড়িয়ে থাক। না হলে স্বয়ং ভগবানও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না।"

তারপর উর্মি হাঁকল, "মিসেস্, আপনি এখন আপনার জিনিষগুলো ওর পকেট থেকে বের করে নিন। মিষ্টার নিচে নেমে আসুন। প্রফেসার, আপনি কিন্তু পিস্তল হাতে একভাবেই থাকুন।

প্রথমেই অবশ্য উর্মি মাটি থেকে ছোরাটা তুলে নিয়েছিল।

"আপনাদের সব জিনিষটা পেয়ে গেছেন?"

হ্যাঁ, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।"

ওদের কোন উত্তর দেবার ইচ্ছে উর্মির করল না।

এই গরীবের দেশে কারো কোন কিছু বাহুল্য থাকাটাই অন্যায়। আরো অন্যায় তা জাহির করা।

এত গয়না পরে মেয়েটাকে ট্রেনে উঠতে দেখে প্রথমেই তা ভাল লাগে নি। তাই ত ওদের সঙ্গে ওর মত কথুনী মেয়েও একটাও কথা বলে নি।

"তুমি ইংরেজী বলছ একদম কারেক্ট। তার মানে, তুমি কিছু পড়াশুনা জান। ক'ক্লাস পর্যন্ত পড়েছ?"

"আমি বি, এ, পাশ করেছি।"

কথাটা যেন বোমার মত এসে লাগল ওর কানে। আস্তে আস্তে উর্মি এগিয়ে গেল ছেলেটার কাছে।

"তোমার আর কোন অস্ত্র লুলানো নেই ত?"

"না।"

"আপনি ওর পকেট সার্চ করে দেখুন ভাল করে," "রাজস্থানী ছেলেটাকে উর্মি বলল।

দেখা গেল, ওর কাছে কিছুই নেই। শুধু ওই ছোরাটাই ছিল।

"ঠিক আছে। তুমি এখন হাত নামাতে পার ও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।"

উর্মিলা দেখল, অল্প বয়সী একটা কচি মুখ। বয়স আর কত হবে? বিশ বা বাইশ। ভীত দুটা চোখ।

"তুমি শিক্ষিত ছেলে। এই রকম ঘৃণ্য কাজে কেন নেমেছ?"

"উপায়হীন হয়ে, বিশ্বাস করুন, এই আমার প্রথম চেষ্টা। এখন আমার মনে হচ্ছে স্বাভাবিক যে আপনারা আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। আমার জেল হবে। একদিকে আমি বেঁচে যাব।" দু'বেলা খেতে পাব। কিন্তু আমার বিধবা মা, আমার ছোট বোনটির কি হবে? তারা ত না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে। মা আমার অসুস্থ- অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়। আমি ভাবতে পারছি না। তার চাইতে আমাকে মেরে ফেলুন। এই দয়াটা করুন।"

ওর কথা শুনতে শুনতে উর্মিলার মনটা যে কি হয়ে গেল। এখন

সে কি করে? এ বেচারাকে কি চুরি করতে দিলেই ভাল হোত না? যাদের নিচ্ছিল, তারা তাদের লোকসানের কথা ক'দিন পরে ভুলে যেত। কিন্তু এই ছেলেটার শেষ পরিণতি কি হোত? সে হয়ে উঠত পাকা ডাকাত। বোধ হয় অনেকদিন ধরা পড়ত না। কিন্তু একদিন না একদিন ঠিকই ধরা পড়ত। এর জেলও হোত। আবার খালাসও হোত।

কিন্তু তখন সে দাগী চোর। তার ফেরার কোন পথ নেই। মনের দিকেও না, বাইরের দিকেও না। সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। মনুষ্যত্বও কোনদিন সে ফিরে পাবে না। এইভাবে পশুর জীবন যাপন করতে করতে হয়ত পুলিশের গুলিতে বা সহকর্মীদের গুলিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে।

একটা সুযোগ তাকে দিতে হবে। সে কি করবে এখন?

"প্রফেসার, পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে এখন আপনি নেমে আসুন।"

"তাই আসছি, ডঃ রায়।"

পিস্তল ছিলও না। শুধু একটা অভিনয় হয়ে গেল।

ছেলেটি বলে উঠল, "আপনি ডাক্তার? আহা, আমি যে মাকে ডাক্তার দেখাবার জন্যই না পেবে এই কাজে নেমেছিলাম। আমার কপাল।"

ওর গলাটা যেন কেমন কেঁপে গেল। উর্মিলা তখন বসে পড়ে ভাবনার মধ্যে ডুবে গেছে। তাকে একটা কিছু করতে হবে। করতে হবেই।

একা উর্মিলাই কথা বলছিল, আর বাকি তিন জন চুপ করে বসেছিল।

"তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ নেই?"

"আপনি বিশ্বাস করুন, ডঃ, আমি একাই।"

"কিন্তু, তুমি দরজা খুললে কি করে?

"এর আগের স্টেশনে আমি পাগলের মত ঘুরছিলাম টাকার জন্য।

মাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। গত চার মাস আমি চাকরীর চেষ্টা করে বেড়াচ্ছি। টিউশানি করি। এই করেই আমি আমার ছোট সংসার ও পড়া চালাচ্ছিলাম। কিন্তু মার অসুখে এতে কুলাচ্ছিল না। এইভাবে চাব মাস আসে বি, এ, পাশ কবি। আরপ দুটা টিউশানির অনেক চেষ্টা করেছি। তাও পাইনি। মাব অবস্থা ভীষণ খারাপ। এদিকে পয়সার অভাবে ডাক্তার ডাকতে পারছি না।"

প্রায় কান্নার সুরে সে বলল, "পাগলেব মত স্টেশনে ভিক্ষা করতে বা মাল বইতে এসেছিলাম। যদি কেউ দয়া করে একটু বেশী কিছু দেয়। কিন্তু দেখলাম, এদিকে কিছু হবাব নয়। তখন এই বুদ্ধি মাথায় এলো। একটা ছেলে ছোরা বিক্রি করবার জন্য বসেছিল প্ল্যাটফর্মে। ভুল লেগেছিল তার চোখে। চট্ করে একটা আমি তুলে নিই আর কামরার দরজা খোলার জন্য একটার পর একটা হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছিলাম। যদি, বাই চান্‌স্ খোলা পাই। তৃতীয় বাবের চেষ্টাতেই পেযে যাই। হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। আস্তে করে উঠে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রেনটা স্পিড্ আপ করতেই···। তারপর ত আপনারা সব জানেন।"

ঊর্মিলা বলে উঠল, "কিন্তু এই দরজা কি করে খোলা পেলে?"

"আমি, বাতে ঘুম আসছিল না বলে, একবার নেমেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে ল্যাচ্ কিটা লাগাতে ভুলে গেছিলাম, "রাজস্থানী ছেলেটি বলে উঠল।"

ঘরের মধ্যে যেন একটা স্তব্ধতা নামল। সবাই যেন অপেক্ষা করছে, ঊর্মিলা কিছু বলবে সবার দৃষ্টি তার উপর।

"তুমি ত ব্যবসার চেষ্টা করতে পারতে।"

"তাতে ক্যাপিটেল লাগে।"

"বেশ, আমি যদি সেই ব্যবস্থা করে দিই, তুমি কথা দিতে পারিবে যে তুমি এ কাজ জীবন থাকতে করবে না?'

ছেলেটির চোখের জল পড়তে লাগল।

"ডঃ, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন? আমি আপনাকে

কথা দিচ্ছি, এ কাজ কোনদিন করব না। আপনার ঠিকানা লিখে দিন। আমি সব আপনাকে জানাব। আমার ঠিকানা আমি লিখে দিচ্ছি।”

ইচ্ছে করেই উর্মিলা শুধু ইংরেজীতেই কথা বলে যাচ্ছিল। বুঝবার জন্য ওর কথার সত্যতা। বি, এ, পাশও যদি না করে থাকে, অন্তত কিছু এলেম ত থাকবে। না, ছেলেটি ইংরেজী মোটের উপর ভালই বলে। মনে হয় পাশই হবে।

“ঠিক আছে। আমার ঠিকানার দরকার নেই। আমাকে প্রায়ই দিল্লী যেতে হয়। তোমার ঠিকানা দাও। সুবিধামত গিয়ে হাজির হব।”

তারপর উর্মিলা ফিরে তাকাল রাজস্থানী দম্পতির দিকে। নিশ্চয়ই ওদের বেশ কয়েক হাজার টাকা সে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এখন ওদের কাছ থেকে ছেলেটার জন্য শ' পাঁচেক চাওয়াটা কিছু অন্যায় হবে না।

“শুনলেন ত, ছেলেটার সব কথা। আমি ওর কথা বিশ্বাস করি। সৎপথে থাকার জন্য আমাদের কর্তব্য, ওকে সাহায্য করা। আসুন, আমরা তাই করি। আপনাদের কারো আপত্তি আছে?”

ডঃ গাঙ্গুলীর গলা প্রথমেই শোনা গেল, “আমি এক মত। যা করতে বলবেন, আমি তাতে রাজি।”

অন্য যাত্রীরাও সায় দিল।

“বেশ। আপনাদের কিছু বাঁচল। তাই আপনাদেরই উচিত হবে আসল ভারটা লওয়া।”

“সে ত নিশ্চয়ই। আপনি আমাদের যে উপকার করলেন, তা কোনদিন ভুলবার নয়,” যুবকটি বলে উঠল।

উর্মিলা যুবকটির দিকে তাকিয়ে বলল, “বেশ, আপনি পাঁচ শ টাকা দিন। এই টাকা মূলধন করে ও ব্যবসা আরম্ভ করবে। আর আমরা দুই প্রফেসার একশ একশ করে দেব, ওর মার চিকিৎসার জন্য।” উর্মিলা চুপ করল।

ছেলেটির মুখে একটা আশার আলো ফুটে উঠল—“আপনি আমার গুরু। শত বিপদেও কখনও আমি অসৎ পথ ধরব না।

আজকে ভগবান বুঝিয়ে দিলেন—যা হবার তা হবে। যা করবার, তা একমাত্র উনি করতে পারেন। না হ'লে আমি যা ভেবেছিলাম, যা করেছিলাম, তাত হোল না। হোল অন্য কিছু।"

ততক্ষণে রাজস্থানী ছেলেটি টাকা বের করে উর্মিলার হাতে দিল। উর্মিলা উঠে গিয়ে বাক্স খুলে টাকা বের করল, ও ডঃ গাঙ্গুলীর কাছ থেকেও নিল।

"এখন ভাবছি, তোমার পকেট থেকে যদি খোয়া যায়।"

"না, তা ভাববেন না। আমি খুব সাবধানে নেব। পরের স্টেশনে নেমেই বাড়ী যাবার ট্রেন ধরব। আপনি ভাববেন না। আমার চোখে আপনিই ভগবানের অংশ; তাইত আপনার ভিতর দিয়ে আজ তাঁর আশীর্বাদ পেলাম।"

পায় হাত রাখল ছেলেটা।

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

ট্রেনটার গতি মন্থর হতে আরম্ভ করেছে। পরের স্টেশনে থামবার সময় এসে গেছে। উর্মিলা তাড়াতাড়ি ফলের ঝুড়ি থেকে কিছু ফল বের করে একটা থলিতে করে ওর হাতে দিল।

"মাতাজির জন্য দিলাম। আর এই নাও আরও ত্রিশটা টাকা তোমার পাথেয়।

"দিদি, আপনি এত দিলেন! আবারও।"

"ভাই, এসব কিছু না। আমার আকাঙ্ক্ষা তুমি পূর্ণ কোর। তোমাকে দিয়ে আমি অনেক আশা রাখি। যদি তুমি দাঁড়াতে পার, জেনো, বছর খানেকের মধ্যে আবার আমার দেখা পাবে এবং দরকার হলে আরও সাহায্য পাবে তোমার প্রচেষ্টার সফলতার জন্য।"

ট্রেন থামতে, ছেলেটা সকলকে নমস্কার করে নেমে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে উর্মিলার মনে হোল, এ যেন কিছুক্ষণ আগের ছেলেটা নয়। এ যেন অন্য কেউ। যার সামনে শুধু অন্ধকার নয়, আলোর রেখাও উকিঝুঁকি দিচ্ছে।

যতক্ষণ দেখা গেল, জানালা দিয়ে উর্মিলা তাকিয়ে রইল। মনে

মনে যেন বলতে লাগল,—ওকে মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ দিও এটা কি খুব বেশী বড় চাওয়া ? বোধ হয় নয়।

"ডঃ রায়, আসুন। বসুন এসে। আর ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

ডঃ গাঙ্গুলীর কথা শুনে ফিরে চাইল।

"একি ! আপনিও দাঁড়িয়ে আছেন ? হ্যাঁ, চলুন বসা যাক।"

ট্রেন ছেড়ে দিল।

তিন

ট্রেন চলেছে নির্বিকার ভাবে। তারই একটী ছোট কামরাতে যে কত কিছু ঘটে গেল, কিছু কি তার গতিকে মন্থর কোরল ? এর কামরাগুলোতে কত কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

যাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে নানা ধরনের ভাগ্য নিয়ে চলেছে। হতে পারে, অনেকদিন পরে স্ত্রী চলেছে স্বামীকে মিট করতে। মেয়ে চলেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে মা-বাবার সান্নিধ্যে। আবার কেউ তার আপনজনের বিপদ শুনে উৎকণ্ঠার মধ্যে রাত্রি কাটাচ্ছে। সুখ দুঃখ চলেছে। একই দোলায় দোল খেয়ে। এযেন একটা ছোট্ট পৃথিবী।

"রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এলো এ রকম যে একটা কিছু ঘটবে আমরা কেউ কি বুঝতে পেরেছিলাম, উজ্জ্বল বাবু ? তাই মনে হয়, কেন যে মানুষের এত পরিকল্পনা ? পাঁচ বছরের পরিকল্পনা, উর্মিলার মুখে একটু হাসি খেলে গেল।

'এক মিনিটের মধ্যেই জানিনা কি হবে ?

ডঃ গাঙ্গুলীর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে উর্মিলা বলে উঠল, "কি হোল ? কোন কিছুর উত্তর দিলেন না যে ?"

"আমি ভাবছিলাম, আপনাকে দেখে কি একবারও মনে হয়েছিল, আপনি অসাধারণ মহিলা ? আপনার কথাতে বুঝেছিলাম, আপনি মোটেই সাধারণ নন। তাছাড়া. দেখতেও আপনি খুব আকর্ষণীয়। সব

মিলিয়ে আপনি আর দশটী মেয়ের মত নন। কিন্তু অসাধারণ? না, তা মোটেই বুঝতে পারিনি। সত্যিই, আমার মানুষ চেনার ক্ষমতা কত কম,—তাই ভাবছিলাম।"

এতক্ষণে ঊর্মিলা তার সহজাত স্বভাবে ফিরে এসেছে। একটুক্ষণ আগের ঘটনার আবেষ্টনী থেকে বুঝি মুক্ত।

"বাপরে আপনি যে অনেক কথা বলে গেলেন? একবারো ভেবে দেখলেন না, আমার অবস্থায় অনেকেই এটা করত। তাছাড়া, আমার গায়ের রংটা খেয়াল করেছেন ত, শস্য শ্যামলা। যার কদর এদেশে কম।"

"আমি ত বলিনি, আপনার কট্‌কটে বা ধবধবে গায়ের রং। আমি বলেছি আকর্ষণীয়। পশ্চিমের মেয়েদের সকলেরই ও কট্‌কটে রং। তা বলে সবাই দেখতে ভাল? যাকে দেখতে ইচ্ছে করে, যে টানে, সেই চুম্বক শক্তি যার আছে। সেইত প্রকৃত সুন্দর বা সুন্দরী।"

আরো যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ডঃ গাঙ্গুলী।

ঊর্মিলা বুঝল, তার ফিগারের কথা বলতে গিয়ে থেমে গেছেন। ও খুব ভাল করেই জানে, তার দেশে তার মত ফিগার খুব কম মেয়েরই আছে। সে অনেক সময় ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছে আর বুঝেছে, বিউটিকম্‌পিটিশনে যোগ দিলে রাণী হওয়া থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারত না। তার কিন্তু এদিকে কোন দিন উৎসাহ ছিল না বা নেই।

তার পড়া, পড়ানো ছাড়া আরো একটা আকাঙ্ক্ষা আছে—রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারার। তাতে ও এর মধ্যেই বেশ নাম করেছে। ফিরে গিয়েই তার গান রেকর্ডিং হবে। অবশ্য এটাই তার প্রথম।

"ভোর ত হয়ে এলো। বেশ টায়ার্ড হয়েছেন আপনি, একটু শুয়ে নেবেন নাকি?"

"না থাক, বেশ লাগছে বসে বসে আপনার সঙ্গে গল্প করতে, উজ্জ্বলবাবু। দেখুন, পুবদিকে সূর্যদেবের ওঠার সময় হয়ে এসেছে। তাই প্রকৃতি কি ভাবে নিপুণ হাতে সুন্দর করে পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

"সত্যিই বলেছেন। বড় ভাল লাগছে। এটাও ঠিক বলেছেন—একটু পরেও কি হবে, তা কিছুই আমরা জানি না। এই যে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠেছিলাম খোলা মন নিয়ে। কত শত বার ট্রেনে চড়েছি এখান থেকে সেখানে যেতে। ঠিক সেই রকম এও একটা যাত্রা। তখন কি একবারও মনে এসেছিল, এযাত্রা হচ্ছে পরম যাত্রা? আপনার মত একজনের সঙ্গে দেখা হবে পরিচয় হবে।

একটু থেমে উজ্জ্বল আবার সুরু করল, একবারের যাত্রা এনেছিল পরম দুর্ভাগ্য যখন গিয়েছিলাম মৃতপ্রায় বোনের কাছে। আর এই যাত্রা এনে দিল পরম সৌভাগ্য, আপনার মত একজনের সঙ্গে হোল পরিচয়। হতে পারে, ভবিষ্যতে আর নাও দেখা হতে পারে; কিন্তু এ দেখা থাকবে মনে চিরদিন, আর যোগাবে আনন্দ, শান্তি।"

ঊর্মিলা একমনে ওর কথা শুনছিল—তাই ত ঠিক এমন মানুষ ত বড় একটা দেখা যায় না।

সেও ত এই কথা বলতে পারে—আপনার ধরনের আমি দেখেছি শুধু একজনকে—মল্লির স্বামী ইন্দ্রজিৎকে।

মনে পড়ে গেল অনেক বৎসর আগের কথা। তখন বি, এ, ক্লাসে। বড় ছটফটে, সেন্টিমেন্টাল মেয়ে ছিল। মল্লিকার বাড়ীতে ইন্দ্রজিৎকে প্রথম দেখেই ওর ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল। বলতে গেলে ভালই বেসে ফেলেছিল।

সেই বয়সটা, যখন সত্যিকারের ভালবাসা বুঝবার বুদ্ধি বা শক্তি, কোনটাই হয়নি। হাসি পেল ভেবে, এমনই মোহে পড়ে গিয়েছিল যে, কাদন ওর সঙ্গে দেখা না হওয়াতে ছুটে গিয়েছিল ওর বাড়ীতে। লজ্জার মাথা খেয়ে প্রেম নিবেদনও করেছিল।

সেই ইন্দ্রজিৎ, তার বড়ত্ব, ভালত্ব দিয়ে বুঝেছিল—ছেলে মানুষের ছেলেমানুষী। এখন ইন্দ্রজিৎ তার দাদা। তার সেই অল্প বয়সেই আরো একটা বোকামী থেকে রক্ষা করেছিল।

সেই ঊর্মিলা, আর এই ঊর্মিলা এক মানুষ, সে ভাবতেই পারে না।

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মানুষ কত বদলে যায়। কিংবা আসল সত্তা তার বেরিয়ে আসে।

ভিতরে সে বদলে গেছে, যদিও বাইরেটা তার মনে হয়, একই রয়ে গেছে।

"আচ্ছা, ডঃ গাঙ্গুলী, মনে হচ্ছে যেন আপনি বলেছিলেন সকালের ব্রেকফাষ্ট খাওয়াবেন।

"খাওয়াবই ত, বলেছিলাম ত।"

"তবে কথায় ইতি দিয়ে বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে রেডি হই? কি বলেন?

"নিশ্চয়ই," হেসে বলল ডঃ গাঙ্গুলী।

ছেলেটীকে যে অল্প হলেও সাহায্য করতে পেরেছে সেই কথাটা উর্মিলার মনে বেশ একটী খুশী খুশী ভাব এনে দিয়ে ছল। সুটকেশ থেকে সাড়ী বের করতে করতে সে গুণগুণ করে উঠল, আজ সরার রং এ রং মেশাতে হবে।"

ঠিক ঠাক হয়ে যখন উর্মি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, কামরার তিন জনের চোখই গিয়ে আটকে গেল তার দিকে। কমলা রং এর প্রিণ্টেড সিল্কের সাড়ী পরা এ কোন লক্ষ্মী।

এত সমুদ্র মন্থন করে পাওয়া সত্যযুগের লক্ষ্মী নয়, যার উদ্ভবের সময় মহাদেবকে বিষ পান করতে হয়েছিল। এ হচ্ছে কলিযুগের যে প্রয়োজনে নিজেই বিষ পান করে নিজেকে শুদ্ধ করবার শক্তি রাখে।

রাজস্থানী যুবকটী বলল, "আমরা কিছুক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছি সবাই মিলে একসঙ্গে সকালের খাবার খাওয়া যাক না।"

ডঃ গাঙ্গুলী বলে উঠলেন, "কিন্তু"।

চোখের ইশারায় উর্মিলা প্রফেসারকে চুপ করিয়ে দিয়ে হেসে রাজি হয়ে গেল। "ভালই হবে। আপনাদের সঙ্গে, বলতে গেলে চেনাই হয়নি। জানবার বুঝবার একটা সুযোগ হবে।"

মহিলাটী বলে উঠল, "সবাই ডাইনিং কারে গেলেত কামরাটা একেবারে খালি পড়ে থাকবে।"

"ঠিকই" বলেছেন, আপনি। এখানে জমিয়ে বসে খেলে ক্ষতি? কি ভেবে নিলেনই হবে, এটা হচ্ছে আমাদের স্পেশ্যাল ডাইনিং রুম আমাদের চার জনের জন্য রিজার্ভ।"

উর্মিলার কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল।

"আপনি কথাও বলতে পারেন," উক্তিটী বেরিয়ে এলো রাজস্থানী যুবকের মুখ থেকে।

"শুধু কথা বলতেই বুঝি পারেন? তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে জুজুবুড়ীর মত ওপরে বসে ছিলে। গত রাতে উর্মি না থাকলে কি হোত?

স্ত্রীর কথাতে স্বামীর মুখটা যেন চুণ হয়ে গেল।

ডঃ গাঙ্গুলী বলে উঠলেন, "সবাই ত আমরা মানুষ। সেখানে ছেলেমেয়েতে কোন তফাৎ নেই। তবে সত্যিকারের মানুষ ক'জন হয়? ডঃ রায় হচ্ছেন সত্যকারের একটী দুর্লভ মানুষ।"

"খুব ঠিক কথা বলেছেন, ডঃ গাঙ্গুলী," মেয়েটী সোৎসাহে বলে উঠল।

উর্মিলার আর এসব কথা ভাল লাগছিল না। তাই পরিবেশটা পালটে দেবার জন্য বলে উঠল, "যাক্ বাবা, ভাল বুদ্ধি করেছেন আপনি। এইভাবে কথা বলতে বলতে স্টেশন এসে পেরিয়ে যাক, আর কষ্ট করে খাবার অর্ডার দিতে হবে না।"

যুবকটীর দিকে এরপর তাকাল, "খিদে কিন্তু আমার খুব পেয়েছে। আর সবার কথা জানি না।"

স্টেশনে গাড়ীটা থামল। ছেলেটা চট করে অরডার দিতে নেমে গেল!

এতক্ষণ সবাই ইংরেজীতেই কথা কইছিল। এখন দেখা গেল মেয়েটী বাংলাতে কথা বলতে আরম্ভ করেছে।

"আমি কিন্তু বাংলাতে, কথা বলব এখন থেকে।"

"সেকি," আপনি বাংলা জানেন ?"

"নিশ্চয়ই," ডঃ রায়। আমার জন্ম ত কলকাতাতে। থাকিও কলকাতাতে। পড়াশুনাও করেছি ওখানে। মাঝে মধ্যে দেশে যাই।"

"তাই বুঝি ? তবে কেন সবাই ইংরেজী বলে মরছি," বলে উর্মিলা হাসল।

গাড়ী ছাড়ার একটু আগে ছেলেটা এসে উঠল। দুই বেয়ারা পেছনে। উর্মি দেখে বুঝল, একটা ট্রেতে তার ও ডঃ গাঙ্গুলীর ব্রেকফাষ্ট। আর একটাতে তাদের দুজনের। এরা ত নিরামিষ খায়, তাই তাদের জন্য এসেছে সিঙ্গারা, নিমকি, দু'রকম মিষ্টি, চা। তাদের জন্য এসেছে দুটো করে ডিম ফ্রাই, রুটী টোষ্ট, মাখন, মারমালেড ও চা।

এমনিতেই ওর বেশ খিদে পেয়েছিল। তার কোন কথা না বলে গিয়ে বসল নিজের বার্থে। মেয়েটী এসে ওর সামনে ট্রেটী রাখল। ধন্যবাদ দিয়ে দেখল, ডঃ গাঙ্গুলী এসে উল্টোদিকে বসে পড়েছে।

"বেশ খিদে পেয়েছে, না ?"

"তা আর পায়নি ? একে দেরীতে ঘুমোতে যাওয়া, তার উপর অর্দ্ধেক রাত জেগে লোমহর্ষক নাটক করা। দিন দেখি, চাটা ঢেলে। গরম চায়ে এক চুমুক দিয়ে পৃথিবীটাকে রঙ্গীন চোখে দেখতে আরম্ভ করি।"

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে উর্মি বলল, আপনি খুব চায়ের ভক্ত না।

"কে নয় বলুন ত ? আপনি ?"

"তা অবশ্য। সকালে দু'কাপ না খাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুতে জুৎ লাগে না। আবার দুপুরে যখন সারা সকালের খাটুনিতে শরীরটা মিইয়ে আসে, এক কাপ ধূমায়িত চা অবশিষ্ট কাজে আবার প্রেরণা যোগায়। দিনের শেষে নূতন দিনের আশা এনে দেয়।"

"শেষের কথাটা ঠিক বুঝলাম না। ডঃ রায়," "মেয়েটা বলে উঠল।

"খুব সোজা। কাজের শেষে সন্ধ্যোবেলা বাড়ী ফিরে এক কাপ চা খেয়েই ত নূতন উদ্যমে সান্ধ্য আমোদ-প্রমোদে যোগ দেওয়া যায়।"

"খুব সুন্দর বলেছেন। আমি কাজে না গেলেও সারাদিনের ঝঞ্ঝাটের পরে এক কাপ চা না হলে শরীর ম্যাজ ম্যাজ মাথা টিপটিপ।"

মাঝখানে বাধা দিয়ে ছোলটী বলে উঠল "ওর কথা আর বলবেন না। এই বয়সেই এমন অভ্যেস করেছে, বেলা চারটা বাজতেই এককাপ চা চাই। না হলে শরীর খারাপ। আবার সন্ধ্যাবেলা দু'কাপ সবার সঙ্গে।"

এইভাবে ওদের চার জনের পার্টিটা জমে উঠেছিল বেশ। কতরকম যে গল্প হোল তার ঠিক নেই। চারজনের জীবনের ছোটখাট চুট কী যাতে মনটা হালকা করে।

রাতটা কেটেছে দুঃস্বপ্নের মধ্যে, শুধু দুঃখের মধ্যে। সংসারের দুঃখ কষ্টের দিকটা চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাই বুঝি সকলে সেই বাস্তবের হাত থেকে চাইছিল রেহাই।

মানুষ চায় মোহের মধ্যেই কাটাতে। হ্যাঁ, মোহ। তাই ত মানুষ চায় অবাস্তবকে আঁকড়িয়ে ধরতে। বোঝে যে তা ঠিক নয়, সত্য নয়। তা সত্বেও। সেই মনে জোর, মানুষের নেই, যে সত্যটা জেনেও শান্ত হয়ে থাকবে।

তাই মৃত্যু যে চির সত্য, তাকে রুক্ষতে যে কেউ পারে না, সেই চিন্তাকেও ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সবাই ভাবছে আমার কাছে তা আসবে না। আর সবার কাছে আসবে, কিন্তু যে করেই হোক, আমি রেহাই পাব।

খাওয়া দাওয়ার পরে, কি করে জানি, বেশ কিছুক্ষণের জন্য সবাই কেমন নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল। ছেলেটা খবরের কাগজে দিল মন। মেয়েটি হেলান দিয়ে আধা শুয়ে আধা পড়া উপন্যাসটাতে মন দিল। প্রফেসার তার কটমটি বইটা নিয়ে, বোধ হয়, চিন্তার মধ্যে ডুব দিল। উর্মিলা চোখ বুঁজে তার নিজের ভাবনার মধ্যে গেল ডুবে।

বেশ লাগে, এ ভাবে ভাবতে। মনে হয়, থিয়েটার দেখতে কেন যে লোকে খরচ করে মরে? তার চাইতে গান শুনতে খরচ করা অনেক ভাল। চোখ বুঁজে চিন্তা করলেই ত একটার পর একটা থিয়েটার দেখতে পাবে।

এই ত, তার নাতিদীর্ঘ জীবনটাতে কত অসংখ্য নাটক দেখেছে বা দেখছে।

এই ত, প্রফেসারের জীবনটাই ত একটা জীবন্ত থিয়েটার।

ওঠা নামা ক্রমাগত চলেছে। অল্প পরিসরের মধ্যে। সুখের সংসার। সব ভেঙ্গে চুরমার। আবার সুন্দর শান্তির সংসার। আবার দুর্ঘটনার চাপে বিপর্যস্ত। এখন চলেছে কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

ও ভাবতে বসল—সত্যি, শেষটা কি হবে বা হতে পারে? এখনই শেষের কথা কেন ভাবছে। তার ত অনেক দেরী মাঝখানে কত কিছু আসবে যাবে, কে জানে?

দুপুরের খাবার কলকাতায় খাবে। সেই মতলব করেই বেরিয়েছিল সেখান থেকে। শম্ভুনাথ ওকে নিতে আসবে অফিস থেকে। দু'জনে বাইরে কোথাও খেয়ে তারপর যাবে বাড়ী। রাতে সকলেরই মল্লিদের ওখানে খাওয়া। সুহাসদার মাকে মল্লি মোটর পাঠিয়ে আনিয়ে নেব।

কলকাতায় গিয়ে খাবে উর্মিলা, এই কথাতে প্রফেসারের মাথায়ও বোনকে খুশী করার বুদ্ধি এসে গেল। কথাই আছে, সে দিন সকালেই বোন বাড়ী ফিরে আসবে। ওর যাবার কথা বন্ধুকে তার অফিসের ফোনে জানিয়ে দিয়েছে। রাস্তা থেকে ভাল ভাল খাবার কিনে নিয়ে যাবে। দুজনে বাড়ীতে একসঙ্গে খাবে।

কিছুক্ষণ পরে দুই প্রফেসার ডাইনিং কারে চলে গেল। কিছু মিছু খাবার জন্য, যাকে ইংরেজদের মধ্যে বলে ইলেভন্‌সেম্। উর্মিলার ঠিকানা আগেই প্রফেসার তার নোট বইয়ে লিখে নিয়েছিল। রাজধানী দম্পতিও নিয়েছিল লিখে তার ঠিকানা।

ও কিন্তু, দেখা গেল, মাঝ রাতের ছেলেটার ঠিকানা ছাড়া আর কারো ঠিকানা নেয়নি।

ওর উপর ঊর্মিলার যেন একটা দায় আছে। আবার দিল্লি যাবার পথে মাঝখানে নেমে যেতে হবে ওর খোঁজে। কি হোল, কি করল জানবার ইচ্ছে ও রয়েছেই।

তার উপর অল্প বয়সে একবার একজনের কাছে মারাত্মক ঠেকে এই একটা ওর কমপ্লেক্স হয়েছে।

সেটা অবশ্য ভালবাসার ক্ষেত্রে। লোকটা ছিল বিদেশী।

অবশ্য, আর সব ক্ষেত্রে ও জিতেছে। মল্লি ও ইন্দ্রজিতের কাছে পেয়েছে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা। মল্লির বাবা মিঃ সেনও ওকে ভালবাসেন। সেখানে কোন কৃত্রিমতা নেই। বাকিদের ঠিকানা নিয়ে ও কি করবে?

তাদের ইচ্ছা হলে তারাই করতে পারবে খবর।

কলকাতাতে ওর বাড়তি সময় কোথায়? সেটুকুও ভরে রাখে সঙ্গীত চর্চায়।

গাড়ীটা এসে ঢুকল হাওড়া স্টেশনে। জানালা দিয়ে দেখতে পেল শম্ভুনাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। পেছনে একটা কুলি নিয়ে।

ওর খুব হাসি পেল। ওর মুখ দেখে বুঝল, খিদেতে ওর মুখ চোঁ চোঁ করছে। দুপুরে একসঙ্গে খাবে ঠিক আছে বলে প্রায় অর্দ্ধেক দিন ছুটি করেছে। তাই, বোধ হয়, সব কাজ সেরে বেরুতে গিয়ে সময় পায়নি মাঝখানে কিছু মিছু দাঁতে কাটতে।

ট্রেন থামতে থামতেই শম্ভুনাথ লাফিয়ে উঠে এমন হৈ চৈ করে কুলির হাতে জিনিষ দিয়ে ওকে হাত ধরে নামিয়ে নিল যে ঊর্মিলা সময় পেল না সবাইকে নমস্কার করতে। বিশেষ করে প্রফেসারটীকে।

"দাঁড়ান না, কি যে ব্যস্ত বাগীশ আপনি। ডঃ গাঙ্গুলীকে নমস্কার করা হোল না।"

ঊর্মিলা থেমে, চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে কোথাও তাঁকে দেখতে পেল না। রাজস্থানী দম্পতিকে দূর থেকে নমস্কার করল।

মনে হোল, শম্ভুনাথ আর ডঃ গাঙ্গুলী ঠিক বিপরীত ধর্মী লোক। প্রফেসারের যেমন নিজেকে এগিয়ে আনার স্বভাব একেবারেই নেই,

শম্ভুনাথ ঠিক উল্টো যেখানেই থাক না কেন, নিজেকে সবার আগে, সবার সামনে এগিয়ে নিতে পারে। মানুষে মানুষে কত আলাদা।

"কি হোল আপনার? বিদায় গ্রহণ করা হোল?"

উর্মিলার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোকের ঠিকানাও রাখা হয়নি। অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার। লোকারণ্য একেবারে হারিয়ে যায় নি। দু'তিন দিন অপেক্ষা করে যোগাযোগ করলেই হবে।

"হ্যাঁ, হয়েছে। উঃ, সত্যি আপনার মত ব্যস্তবাগীশ লোক ভূ-ভারতে নেই।

"বুঝবেন না ত এই অধমের অবস্থা। পরের চাকর কাজ গুছিয়ে, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি। সেই সাত সকালে খেয়ে এসেছি অফিসে। এক কাপ চা খাবার জন্যও সময় নষ্ট করিনি। খিদেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

"সত্যিই ত, খিদে পাবার কথা। আমি ও কিন্তু দুপুরের খাবার খাইনি। তবে, আপনার মত বলতে পারব না যে কুটোটিও নাড়িনি"।

"ট্রেনে সেটা সম্ভব নয়। আমার ত ভীষণ খিদে পায় ট্রেনে উঠলেই।"

চার

শম্ভুনাথ গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "চলেছি সোজা ব্লু-ফক্সে। আগে থেকে ওদের অরডার দিয়ে রেখেছি। না হলে আজকাল হোটেলে সার্ভ করতে এত দেরী করে। মনে হয়, ওরা ভয় পায় যে লোকেরা এক প্রস্থ খেয়ে এসেছে ওদের ঠকাবার জন্য। তাই সার্ভ করতে ভীষণ গড়িমসি করে যাতে আগের খাবার হজম হয়ে যায়।

উর্মিলা বেশ জোরে হেসে উঠল।

"কি হোল, ডঃ রায়?"

"আপনি হাসাতেও পারেন, আর তার সঙ্গে বানাতেও পারেন।"

হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে যাবার সময় সব সময়ই উর্মিলার বড়

ভাল লাগে। সেই সময়টা সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। সবারই এখন এ কথা জানা হয়ে গেছে। অনেকেই ওকে এ নিয়ে খেপায়।

ব্রীজের কাছে আসতেই শম্ভুনাথ বলে উঠল, "সাইলেন্স প্লিজ্।"

প্রথম প্রথম ও চটে যেত। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। একটু শুধু হাসল।

এই ব্রিজের ওপর দিয়ে কত লোক আসা যাওয়া করে। নানা দেশের লোক, নানা পরিস্থিতিতে। কেউ আসে দেশ দেখতে। কেউ আসে রুজি-রোজগারের জন্য। পুণ্যার্থীদের সংখ্যাও ত বড় কম নয়। সারা ভারতে কালীঘাটের নাম ছড়ান।

এখানে যা চাওয়া যায় তা নাকি বিফলে যায় না। কতখানি বিশ্বাস। যাকে বলে অন্ধবিশ্বাস। একটু বসে যদি চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারে যে, তা যদি সত্যি হোত, তবে এই দেশের লোকের কোন দুঃখ থাকত না।

এ দেশে ত কালীঘাটের মত কত নামজাদা পুণ্যস্থানই আছে।

সন্ধ্যা বেলা গঙ্গার পাড়ে বসে দেখলে দূর থেকে ব্রীজটা একটা মায়াজালের সৃষ্টি করে। সেটা দেখতে উর্মিলার সব চাইতে বেশী ভাল লাগে।

ব্রীজটা কখন ছাড়িয়ে চলে এসেছে। দুপুরের সময়টাই কলকাতার মত ব্যস্ত সমস্ত সহরেও যেন একটু ঝিমুনি ধরে। তাই পার্কষ্ট্রীটে ঢুকতে যতটা সময় লাগা উচিত ছিল, তা লাগেনি।

ব্লু-ফক্সের সামনে এসে গাড়ীটা দাঁড়াল। শম্ভুনাথ একটা নাম করা ফার্মের 'বিগ-শট্'। তাই সে এল ব্লুফক্সে।

উর্মিলা একা হলে ঠিক গিয়ে ঢুকত কোয়ালিটাতে। মধ্য-বিত্তদের ঐ পর্যন্তই দৌড়। এখানকার খাবার ভালই, তবে দামটা একটু নিচের দিকে। সাধারণের একটু পরে ওপরে যারা, তাদের সেটাই টানে। উর্মিলার কিন্তু ওখানেই বেশী ভাল লাগে। আনন্দ করা হয়। মুখও বদলান হয়। খুব বেশী খরচও হয় না। এ দেশে এটাই সীমা হলে বোধ হয় ভাল হোত।

ইন্দ্রজিতের জীবনধারাটা ওর বড় ভাললাগে। ভালভাবে থাকে ওরা। কিন্তু অযথা খরচ নেই। তাইত এদিক সেদিক সাহায্য করতে পারে। মল্লিরা দু'জনে মাসের প্রথমে কত ইন্‌স্টিটিউশনে যে বাঁধা ধরা সাহায্য করে।

ওরও ইচ্ছে করে, কিন্তু এখনও পেরে ওঠে না।

ওরত বাঁধা ধরা চাকরী, বাঁধা ধরা ইন্‌কাম। ওর বাবা ত সর্বস্বান্ত হয়েছেন তার দাদার জন্য। বড় ছেলে অধীপকে জার্মানীতে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে দিয়েই আজ তিনি একটা মাথা গোঁজবার জায়গা করতে পারেন নি।

ঊর্মির ছোট ভাই অনুপ অল্প দিন হোল অডিট্ সারাভিসে ঢুকেছে। সুহাসদার বোন বনানীকে বিয়ে করেছে। মাসে মাসে টাকা পাঠায়। না হলে কি আর ও পারত মা-বাবাকে নিয়ে থাকতে ভালভাবে একটা ফ্ল্যাটে তার রোজগারে। পেনসন আর বাবা কটা টাকা পান।

বড় ভাই ত মেম বিয়ে করে বিদেশী হয়ে গেছে। এ সংসারের পক্ষে অচল পয়সা।

"কি এত ভাবছেন, ডঃ রায়? আপনার তেমন খিদে নেই নাকি? রান্নাটা পছন্দ হচ্ছে না?"

"তা কেন। আপনার সঙ্গে ত প্রায়ই এখানে এসে খাই। ভাল লাগে। মাকে একটা ফোন করে দিলে হোত।"

"ঠিক বলেছেন"।

ঊর্মিলা উঠে গেল ফোনের উদ্দেশ্যে।

"কি রে, ঊর্মি? দেরী হোল পৌছাতে? শম্ভুনাথের সঙ্গে খাচ্ছিস্। খুব ভাল। ওর ত যাবার কথা ছিল। এত দেরী দেখে বড় ভাবনা হচ্ছিল।

ফোনের তারের ভেতর দিয়ে মার খুশীর আমেজটা ভেসে এল।

"মা, আমরা খেয়ে একটু পরে যাচ্ছি। কি বল্লে? অবিনাশ মেসো তোমাদের ওখানে? দাও না, ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলি। কেন তাড়াতাড়ি চলে এলাম? তোমার জন্য মেসো। হয়েছে? বিশ্বাস হোল

না বুঝি ? একটু মিথ্যে বলেছি ঠিকই। কলকাতার এই ছোট্ট গণ্ডীটা ছেড়ে বেশী দিন থাকতে ভাল লাগে না। কি ? গানের জন্য ? এতক্ষণে ঠিক ধরেছ। তোমার বুদ্ধি আছে। আসল কথা টেনে বের করেছ। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম রেকর্ডিং। একটু রেওয়াজ ত করতে হবে।"

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে উর্মিলা এসে বসল নিজের জায়গাতে। ততক্ষণে পুডিং এসে গেছে।

"ওখানকার কোন কথা ত বললেন না ?"

"সময় হোল কোথায় ?"

"ঠিক বলেছেন। খিদের চোটে তখন থেকে ত খেয়েই চলেছি। আপনার স্বার কাছে ত জানলাম আমাদের সকলেরই মিঃ সেনের ওখানে রাতে খেতে হবে। সত্যি, মল্লি আর ইন্দ্রের সঙ্গে আচ্ছাসে লড়াই করব।"

"খেতে নেমন্তন্ন করেছে বলে ?"

হেসে উঠল শম্ভুনাথ, "মোটেই না। ইন্দ্র আমার এত দিনের বন্ধু। একবার ফোন করে খবর ও ত করতে পারে। শুধু কাজ, আর কাজ।"

"আপনি ক'বার ফোন করেছিলেন ?"

"না, তা ঠিক অবশ্য করিনি। এই দেখুন না, নানা পার্টির জোটে যাকে বলে ব্যতিব্যস্ত। ভাগ্যিস গতকাল আপনার বাড়ীতে ফোন করেছিলাম। তাইত আজকের রাতের এনগেজমেনটা ক্যানসেল করতে পারলাম।"

"যাক, যেতে যে পারবেন, এই। আপনি ও পার্টির চোটে অস্থির। মল্লি আর ইন্দ্র কাজের চাপে অস্থির।"

মুখটা যদিও হাসিমাখা ছিল উর্মির, মনে মনে বেশ চটছিল।

"যা বলেছেন, ডঃ রায়।"

উর্মি মনে মনে ভাবছিল—কি বোকা লোকটা, কিছু যদি ধরতে পারে।

ততক্ষণে শম্ভুনাথের মনে হোল কথাটা বেসুরে—ওরা কাজের চাপে ব্যস্ত, আর আপনি ত পার্টির চোটে।

শম্ভুনাথের মনে পড়ল—সে ও ত ভাল ছাত্র ছিল। ইন্দ্রের বাড়ীতে সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে কত আলোচনা হোত ছাত্রাবস্থায়। সে সব কোথা দিয়ে গেল মিলিয়ে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে সে পড়েছে, যেখানে মানুষের শুধু টাকার চিন্তা। টাকা আর টাকা।

মনকে প্রসারিত করবার, মনকে বড় করবার কোন পরিবেশ নেই। টাকা ছাড়া চলে না। টাকা বিশেষ দরকার। কিন্তু তা কি সব কিছু দিতে পারে? একটা সীমা পর্যন্ত। তার পরে ত আর সত্যিকারের কোন প্রয়োজন নেই। তখন বাড়িয়ে চলে শুধু আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা। যার মধ্যে এখন তার মন ঘুরছে।

আরও চাই, আরও দাও। প্ল্যান করে একবারের জায়গায় দশবার ঘুরব। সব চাইতে বড় হোটেলে যাব খেতে। একদিন কত বেশী খরচ করতে পারি, তার যেন একটা পাল্লা চলছে।

এই রেসের কোনদিন শেষ হবে না। মরবার মুহূর্তেও বোধ হয় হা টাকা, দে টাকা করে মরতে হবে।

"ডঃ রায়, আমি কিন্তু ঠিক সে ভাবে বলিনি। আমি যাদের মধ্যে ঘুরি সেটা খুব যে ভাল লাগে, ঠিক তা নয়। তবে কি জানেন? উপায় নেই। ব্যবসায়ীদের মনটা যে টাকার গাঁথুনি দিয়ে সব দিক দিয়ে বন্ধ। তাদের চাকরী করতে গেলে, তাদের সঙ্গে মিশতে হয়। মিশতে হলে অনেকটা তাদের মত মনটাকে ঘুরিয়ে নিতে হয়। তাই কি নয়?"

ঊর্মিলা বুঝল বেচারার খুব লেগেছে। সত্যি, নিজেকে বড় কি রকম মনে হোল। বেচারা এলো কষ্ট করে স্টেশনে, খেতে নিয়ে এলো এত খরচ করে। আর অকৃতজ্ঞের মত সে দিল দুম করে কটা কথা শুনিয়ে।

"না, না। মিঃ মল্লিক, আমি ঠিক সে ভাবে বলিনি। জানেন ত, মল্লি আমার প্রাণের বন্ধু। নিজের ভাইয়ের চাইতেও ওকে আমি ভালবাসি তাই।"

"তাই মনে লাগল?"

"ঠিক।"

"এবার আমার চাইবার পালা। কোন কিছু না ভেবে একটা অবান্তর কথা বলে দিলাম ত আপনার মনে ব্যথা দিয়ে। কোথায় ঠিক করেছি, আজকে আপনি আসছেন, অনেকদিন পরে ইন্দ্রর সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করব।"

আপনার কথাতে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। দু'জন খুব ভদ্র ধরনের লোক, যাকে বলে সত্যিকারের কালচার্ড, এক সঙ্গে ট্রেনে করে এক জায়গাতে যাবে। লক্ষ্ণৌর লোক। স্টেশনে গিয়ে কামরার সামনে দাঁড়িয়ে বলল,—'আপ উঠিয়ে।' আর একজন বলল,—'আপ উঠিয়ে।' এই চলতে লাগল। কেউ ত আরেক জনকে পিছনে ফেলে অসভ্যের মত আগে উঠে যেতে পারে না। এদিকে ট্রেন বেরসিক। এদের ভদ্রতা জ্ঞানটার তারিফ না করে দিল ছেড়ে।"

শম্ভুনাথের মনটা হাল্কা হয়ে গেল। ঊর্মিলাকে ওর ভাল লাগে। কিন্তু ভালবাসতে পারেনি।

প্রথম স্ত্রীকে সে সত্যিই ভালবেসেছিল। তারপর থেকে এত বৎসরের মধ্যে মেয়েদের ভালই লাগত না। মানে, মেয়ে হিসাবে। এই এত বছর পরে একে ভাল লাগে। তার বেশী অবশ্য এখনো মনে হয় না। কোন দিনও বোধ হয় এর চাইতে এগিয়ে যেতে সে পারবে না। স্ত্রীর মিষ্টি মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আবার কখনও ভাবে, এইভাবে চলতে চলতে একদিন দেখবে ঊর্মিলার বিয়ে হয়ে গেল। তখন? তখন সে কি করবে? এইভাবেই যে ঊর্মিলা থাকবে, তার কি গ্যারান্টি আছে?

মনে ত হয়, এতেই ও সুখী। কোন দিন ত কোন কথা হয়নি। বেশ ক'বছর ত কেটে গেছে।

তখনই মনে হোল, এসব ভেবে কি হবে? ঊর্মিলারই বা সময় কোথায়? অবসর সময় ত গান নিয়ে মেতে থাকে।

সবাই কিছু না কিছু নিয়ে মেতে আছে। কিন্তু এরা যা করছে তাতে শান্তি পাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে।

সে কি পার্টির থেকে সত্যিকারের আনন্দ পাচ্ছে? সাময়িক

উত্তেজনা, হৈ, চৈ, চৈ, হুল্লোড়। তারপরে তার রেশ কিছু থাকে না। মানুষের কাছে টাকা দেখিয়ে আদর পাচ্ছে। তা কি সত্যি আদর? না সত্যিকারের মান?

তা বলে ত সে অন্য পথ এখন ধরতে পারে না। বোধ হয় বেশী দেরি হয়ে গেছে। তার স্ত্রী কেন এমন করে চলে গেল? না হলে, যে চাকরিতে সে ঢুকেছিল, তাতেই থাকত। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার। ছোট মিষ্টি সংসার।

মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে উর্মিলা যখন বাড়ীতে এসে ঢুকল, বাবাকে পেল বাইরে। আর মা, মনে হোল বসবার ঘরের জানলা ধরে বাইরের দিকে দেখছে আর মেসোর সঙ্গে কথা বলছে।

উর্মি প্রণাম করতেই বাবার মুখটা আনন্দে ভরে গেল। মা তাড়াতাড়ি এসে হাতটা ধরলেন, "আয়, ভিতরে আয়। একটু বস, জিরো।"

মনের খুশীটা কি করে চেপে রাখবেন, সে চেষ্টা করছেন।

"তোর বাবা তখন থেকে ঘরবার করছে।"

"আর, তুমি মায়া, সেই থেকে যে ঠায় জানলায় কাছে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে আবোল তাবোল বকে যাচ্ছ যেন মনটা আমার সঙ্গে কথা বলার দিকে রয়েছে। তুমি কিন্তু জাননা, মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যাচ্ছিলে অনেক অবান্তর উত্তর দিয়ে। আমি অবশ্য তখন ধরিয়ে দিইনি। এখন বললাম,"—হাসলেন মিঃ সেন।

"তুমি কিন্তু মেসো নিজের কথাতেই নিজে ধরা পড়ে গেছ। আমাকে তেমন কিছু তুমি ভালবাস না," উর্মিলা আরামসে বলে বসল।

"সে আর বলতে। মা-বাবার মত কি আর কেউ পৃথিবীতে ভালবাসতে পারে। তবে এটা তোকে মানতেই হবে যে, তারপরেই এই বুড়ো মানুষটা ভালবাসে। আমার উর্মিলাকে সবার আগে দেখব বলে তখন থেকে এসে এখানে বসে আছি।"

উর্মির বড় ভাল লাগছিল এই স্নেহের আবেষ্টনীর মধ্যে এসে। এর সঙ্গে কোথায় লাগে দিল্লীর চাকচিক্য।

মিঃ সেন বলে উঠলেন, "এস বাবা শম্ভুনাথ। বস। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? কতদিন তোমাকে দেখিনি।"

"হ্যাঁ, আমারই অন্যায় হয়েছে। আগেই আসা উচিত ছিল।"

শম্ভুনাথ বসে ভাবছিল, মনে হয়, মনে হয় ওর জীবনটা এই পর্যন্ত শুধু ভুলে ভরা। বি, সি, এস, পরীক্ষায় পাশ করে জীবনের শুরুটা বেশ হয়েছিল। মা-বাবার উৎসাহে খুব তাড়াতাড়ি বিয়েও করেছিল। ভাগ্য গুণে পেয়েছিল এমন স্ত্রী এতকাল পরেও ভুলতে পারেনি।

হঠাৎ সে চলে গেল অপর পারে। দুঃখটা তার এত বাজল যে সহ্য করতে না পেরে চাকরীতে দিল ইস্তফা।

তারপরে বিলেত যাবার সুযোগে সেখানে গেল চলে। বেশ কয়েকটা ডিগ্রি জুটিয়ে তার সঙ্গে সেখানে একটা ভাল চাকরীও নিল জুটিয়ে। টাকাও পাঠান অনেক দেশে। মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা নিজস্ব ছোট বাড়ী। তা পূর্ণ করল। দেশে ফিরল চাকরী নিয়ে। ছোট বোনের বিয়ে দিল ধুম করে।

নিজে কি পেল?

এতদিন বাইরে থেকে মা বাবার স্নেহ ভালবাসাপূর্ণ সান্নিধ্য থেকে হোল বঞ্চিত অনেক বছর। ফিরে আসার পরে কটা বছর আর তাঁরা ছিলেন বেঁচে?

মনে হয়, সেই ঠকল সব দিক দিয়ে। স্ত্রীর মৃত্যু ত ভগবানের হাতে।

কিন্তু দেশ ছেড়ে যাওয়া, চাকরী ছেড়ে যাওয়া, এসব যদি সে না করত, তবে মা-বাবাকে কাছে নিয়ে বেশ অনেক বৎসর সে কাটাতে পারত। তাঁদের নিজস্ব বাড়ী করে দিতে না পারলেও তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁরা পেতেন লোকের কাছে সম্মান, আদর। একটা মাঝারী মত ভাল বাড়ীতে থাকতেও পেতেন সবার উপরে পেতেন ছেলের সান্নিধ্য। তার থেকে বছরের পর বছর বঞ্চিত হয়ে কত কষ্ট পেয়েছেন।

প্রথম প্রথম কত করে লিখেছিলেন,—'বাড়ী আমাদের দরকার নেই। কোন কিছুর আমাদের দরকার নেই। শুধু তোকে দরকার'।

পরে যখন বুঝেছিলেন ছেলে ফিরবে না, এসব লেখা দিয়েছিলেন ছেড়ে। শুধু করতেন কুশল প্রশ্ন। ভাল আছেন ছাড়া বই একটা কিছু লিখতেন না।

সে ফিরে আসার পরে খুব শান্তি পেযেছিলেন। হারিযে যাওযা বছরগুলো ত আর ফিরে আসেনি।

উর্মিলার মা বাবাকে দেখে এসব কথা মনে এল।

"কি হোল, মিঃ মল্লিক? এতটা পথ ড্রাইভ করে মনে হচ্ছে বেশ থকে গেছেন। চুপটি করে বসে আছেন একদম। আসুন, চা খাবেন।"

কিছু না বলে ত উর্মির পিছনে পিছনে গিযে ঢুকল খাবার ঘরে।

উর্মি সবাইকে রাস্তার সব ঘটনা এক এক করে বলছিল। কি করে ডাকাত হওযাব হাত থেকে ছেলেটাকে বাঁচাল ও তাকে সাহায্য কোরল ও ব্যবসা কবতে উৎসাহ দিল।

"আমার খুব জানতে ইচ্ছে৷ করছে ও সত্যি সত্যি আমার কথা মত ব্যবসা করবাব চেষ্টা করবে কিনা। ওর মাতাজী ভাল হযে যাচ্ছে কিনা। ইচ্ছা কবলেই মল্লির কাছ থেকে চেযে আরও টাকা ওর ঠিকানায পাঠিয়ে দিতে পাবি। কিন্তু তা করব না।"

"কেন রে?" মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"বুঝলে না, বিশ্বাস কি সহজে করা যায? তাই ঠিক করেছি যে ছ'মাস পবে যে আবার আমার দিল্লি যাবার কথা, তখন পথে নেমে ছেলেটার ঠিকানায হাজির হব। যদি দেখি, আমার কথা সে রেখেছে, তবে কলকাতায় ফিরে এসে বেশী করে টাকা পাঠাব।

"উর্মির লাইনটাই ঠিক হবে। আগে ত দেখে নেওযা দরকার", ব্রজেনবাবু বললেন।

উর্মিলার মনের মধ্যে তখনি ডঃ গাঙ্গুলীর কথা এল। হ্যাঁ, উনিও ত যাবেন দিল্লিতে মিটিংএ। এক সঙ্গেই ছেলেটার সন্ধান করতে হবে। বেশ ভাল আর ইন্টারেস্টিং লোক।

এই দুটোর যোগ বড় একটা হয না। একটা হয় ত আর একটা হয় না।

মল্লিকাদের বাড়ী এসে পৌঁছাতে শিবুর মা সাদরে অভ্যর্থনা করল। এখানে সেই হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যিকারের গিন্নি।

পুরোন কাজের লোক। একটা ছেলে ছাড়া তিন কুলে কেউ নেই। ছেলে ভাল কাজ করে। কিন্তু বিয়ে করে কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে।

শিবুর মা মল্লিকে বড় ভালবাসে। ছেলের কাছে ধাক্কা খেয়ে মল্লিকেই আঁকড়ে ধরেছে। এরাও সকলে ওকে বড় ভালবাসে।

যত দিন যাচ্ছে আইন ব্যবসাতে মল্লিকা যেমন নাম করছে, তেমনি কাজের চাপে যেন মাথা তোলা মুস্কিল হচ্ছে। তাই শিবুর মাই এখন সব সামলায়। তারই হাতে সব।

"এস উর্মিদিদি। কদিন তুমি ছিলে না। এতদিন পরে বড় ভাল লাগছে তোমাকে দেখে। আসুন, আপনারা সকলে বসুন। দিদিমনি আর দাদাবাবুর কথা বোল না। সবে ত ফিরল। ওপরে গেল দুজনে ধরা চূড়া ছাড়তে।"

একটু দম নিয়ে বেশ ভারিক্কি চালে শিবুর মা বলল, "আমিও বলি বাপু। বলিহারি সব মিনসেদের। দিদিমনিকে না হলে তারা জিততে পারবে না। তাকে তাদের দরকার। সকাল থেকে সব ধন্না দিয়ে লাইন দেয়। বলত তোমরা, এমন করলে চলে? ঐ ত একটা বাচ্চা। মেয়ের না আছে খাওয়া না আছে দাওয়া। ঘুমই কি পুরো হয় কাজের চাপে।"

"তা তোমার দাদাবাবু কিছুটা ভার নিলেই ত পারে।" উর্মিলা মুচকি হেসে বলল।

"ওমা, কি কথা বললে তুমি গো উর্মিদিদি? দাদাবাবুর যে অবস্থা তেমনি কাহিল। রাজকুমার ত দাদাবাবুর লোক গুলোকে তাড়িয়ে পারে না।"

উর্মি বুঝল, শিবুর মা দুজনের কাউকেই খাটো করতে রাজি নয়।

ততক্ষণে মল্লিকা নেমে এসেছে।

"শিবুর মা, তোর কথার ফুলঝুরি কমিয়ে দে না। সবাইকে কফি দে। আমাকে দে আগে। আমার খুব টায়ার্ড লাগছে। সারাটা দিন যা গেছে।"

"এখুনি দিচ্ছি, দিদিম'ন।"

"কতদিন পরে মিঃ মল্লিকের সঙ্গে দেখা। দাঁড়ান, আগে কফিটা খেয়ে নিয়ে আপনার সঙ্গে গল্প করছি।"

"একি ! তুই এক ঢোকে এক কাপ কফি শেষ করলি ?"

"কি করি, বল উর্মি। না হলে যে শরীরের গ্লানিটা যেতো না। আজকে যে তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"সবার আগে এই নে। দিদিভাই তার বংশের, বলতে গেলে, ছেলেকে দিয়েছে এই শাড়ীটা পাঠিয়ে।"

পাঁচ

উর্মিলার বলাব কায়দায় সবাই বেশ এন্‌জয় করল।

"দিদি ভাইয়ের কথা রাখ। ও এই রকমই।"

মিসেস্ গুপ্ত অর্থাৎ ডঃ সুহাস গুপ্তের মা ও ইন্দ্রজিৎ এসে পড়ল। খাবার টেবিল বেশ জমে উঠল। দি.ল্লর কথা, কলকাতার কথা, রাজনীতি, মোকদ্দমা, পার্টি, নিজেদের কথা ; কোন কিছুই বাদ গেলনা।

পরের দিন ইন্দ্রজিৎ সবাইকে ম্যাটিনীর শোতে থিয়েটার দেখাবে, এই কথা ঠিক হওয়ার পরে সোদনের মত সভা ভঙ্গ হোল।

সকালে গিয়ে কে টিকিট্ কিনবে ? মল্লিকা ও ইন্দ্রজিতকে অনেক নথি-পত্র দেখতে হবে। উর্মিলার গান প্র্যাকটিস করতে হবে। শম্ভুনাথ মল্লিকাও যেন কি একটা ব্যস্ততার কথা বলতে যাচ্ছিল।

সবাইকে থামিয়ে দিয়ে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, "না, তোমরা সব ব্যস্ত-সমস্ত লোক। আমি আর ব্রজেন আছি দুই নিষকর্মা। আমরাই মোটরে করে হাওয়া খেতে খেতে চলে যাব টিকিটের উদ্দেশে।

"আমরাও যাব, কি বল বাণী ?" মায়াদেবী বলে উঠলেন।

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সকালের ড্রাইভটা কেন ছাড়ব ?

তাই ঠিক হয়ে গেল, চার সিনিয়ার টিকিট নিয়ে আসবে। তারপর

মিঃ মল্লিক, উর্মি ও তার মা বাবাকে নিয়ে যাবে আর বাণীদেবী যাবেন মল্লিকাদের মধ্যে।

কদিন উর্মিলার বড় ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেছে। প্রথম দিন গানের রেকর্ডিং এর জন্য ব্যস্ততা। ভাল ভাবেই হয়ে গেল।

পরের দিন থেকে কলেজে পড়াতে যেতে আরম্ভ করবে। কদিনের ছুটী শেষ হয়ে গেছে। সকালে কাজে বেরোবার মুখে পড়ল বাধা।

মা হঠাৎ মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে খাট ধরে বেঁচে গেলেন। বাবার একবার হার্ট এটাক হয়ে গেছে। তাই উর্মিলা তাকে চট করে কিছু বলতে ভয় পায়।

ডাক্তারকে ফোন কারই মল্লিকে ফোন করল। ভাগ্যিস্, বাবা একটু হাঁটতে গেছেন। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু দেখে গেছেন। পাশের বাড়ীতেই চেম্বার। খুব সুবিধে।

বলে গেছেন.ভয়ের কিছু নেই। লো ব্লাড্ প্রেসারের জন্য হয়েছে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এ থেকেও ষ্ট্রোকের ভয় থাকে। চাকরকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছে। ওর যেন চারিদিকে অন্ধকার মনে হোল।

বাবার শরীর মোটেই সুবিধার নয়। অনুপের কথা মনে হোল। দু'দিন আগে চিঠি এসেছে। অনুপ কদিনের জন্যে টুরে বের হচ্ছে। সঙ্গে বনানী ও বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে। অল্প দিন করে থাকবে এক একটা জায়গাতে। ফিরে এসে চিঠি দেবে। এর মধ্যে ওরা যেন না লেখে।

বিয়ের পরে নিজের ছোট সংসার নিয়ে অনুপ বিশেষ ব্যস্ত। দায়িত্ব জ্ঞান আছে যথেষ্ট। মাসান্তে টাকা সময় মতই পাঠাচ্ছে। দু'জনেই ওখানে যাবার জন্য যথেষ্ট আদর করে। আসেও মাঝে মাঝে।

তবুও উর্মিলার মনে হয় বাইরের দূরত্ব ভেতরেও তার ছাপ ফেলছো ধীরে, অতি ধীরে।

যত দিন যাচ্ছে, তাদের ছুটীতে আসাটা কমে যাচ্ছে। এদিক, সেদিক দেশ ঘোরার তাড়াটা আপন জনের কাছে আসার আকাঙ্ক্ষাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

এ কথাটি মনে আসতেই, মনে ব্যথা পেল।

চাকরের কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে মাকে খাইয়েছিল। "মা, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি আর আজকে কলেজে যাব না। ফোন করে দিচ্ছি।"

"ক'দিন তোর কামাই গেল। আমার জন্য ভাবিস না। এখনই তোর বাবা আসবেন।"

"তা কি হয়। তুমি এসব নিয়ে ভেব না। আমি ফোন করে দিচ্ছি। প্রিন্সিপ্যালকে।"

মল্লিকে ফোন করে শুনল, একটু আগে বেরিয়ে গেছে ওরা।

মিঃ সেন ধরলেন, "কি বলছিস্? মায়ার অসুখ? ডাক্তার এসেছিল? ওষুধ খাইয়েছিস? আমি এখানে ট্যাক্সি করে আসছি। আমাদের বাড়ীর ডাক্তারকে বোধ হয় পাব। ওকে নিয়ে আসছি। সেকেণ্ড ওপিনিয়ন নেওয়া ভাল।"

উর্মিলা ফোনটা ছেড়ে দিয়ে এসে মার কাছে বসল। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। মার দিকে তাকিয়ে, মনে হোল, বড় ক্লান্ত

জাগা অবস্থায় আসল রূপটা ধরা পড়ে না কারো। মানুষ সব সময় চেষ্টা করে নিজের দুর্বলতা, দুঃখ, কষ্ট লুকিয়ে রাখতে।

শুধু কি পরের কাছ থেকে? তা নয়। নিজের কাছ থেকেও।

তাই নিজেকে ঠকানর জন্যই চেষ্টাটা থাকে বেশী। তা না করলে তার এই সুদূর পথ অতিক্রম করা হয়ে উঠত দুরূহ।

ঘুমের মধ্যে সে তা পারে না। তাই পড়ে প্রায় ধরা। অনেক দিন পরে যেন আর অন্তরটা সে দেখতে গেল বড় স্বচ্ছভাবে।

এক ছেলে একেবারেই পর হয়ে গেছে। অন্য ছেলেটা আস্তে আস্তে নিজের ছোট গণ্ডীর মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া শুরু করেছে।

সেটা কয়েক বৎসর পরে, বোধ হয়, বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে যা মা অনেক আগে থেকেই উপলব্ধি করছেন। মার মন।

তাঁর কাছে সন্তান এত মূল্যবান বলেই, বোধ হয়, সর্বক্ষণ খোয়া যাবার ভয়।

উর্মির ত এতদিনের মধ্যে এইভাবে অনুপদের কথা মনেও আসেনি। মার করুণ মুখটাই এর জন্য দায়ী।

এত ভাল তার ভাই, এত ভাল বনানী, তাই—তাই ত শুধু ভেবেছে। সত্যি! ভাইটা যদি এর চাইতে কম মায়নার কাজ করত, যদি একসঙ্গে থাকত টাকার টানাটানি হোত না। হলেই বা কি? সবই মানিয়ে যেত।

এই যে দূরত্বের দেওয়াল মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছে, এখন অবশ্য, বোধ হয়, এক আধ খানা ইঁটের, গাঁথুনিই পড়েছে। কে জানে, সময়ে তা কতটা উঠবে। ভালবাসা থাকবে, কিন্তু তার আকর্ষণটা কি একই থাকবে?

বোধ হয় তা থাকে না।

এই যে টুরে বের হয়েছে, প্রত্যেক জায়গায় থেকে এক লাইন যে লিখবে, তা ত লেখেনি। বা এত ত লেখেনি যে, হঠাৎ দরকার হলে টেলি করলে, তার আফিস্ থেকে খুলে পড়ে তাকে জানাবার ব্যবস্থা করে গেছে।

সে নিজে অন্যরকম, কিন্তু সেও, বোধ হয়, দূরে থাকলে এই রকমই হোত।

ব্রজেনবাবু পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকলেন। চাকর নিশ্চয়ই সব বলেছে। উর্মিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, বাবাকে সব বলল।

"আর শোন, তুমি মার কাছে বস। মেসো তার ডাক্তার নিয়ে এখনই এসে পড়বে। আমি একবার যাই, রান্নাঘরটা ঘুরে আসি।

"তাই যা। মায়াটার অসুখ করলে কিছু ভাল লাগে না।"

"এ আবার কি কথা? মানুষের অসুখ করবে না? মা দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু তাই বলে গেছেন।"

"ভাগ্যিস্ তুই আছিস্। অধীপকে বাদই দিলাম। অনুপটাকেও ত কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। তার উপর এই ত পনের দিনের জন্য বাইরে গেছে। তুই আছিস। তুই-ই বা আর ক'দিন?

"না। যত বাজে চিন্তা তোমার মাথায়। ট্যাক্সি আসার আওয়াজ

পেলাম। মেসো ডাক্তার নিয়ে এসে গেছে। যাই," বলতে বলতে উর্মিলা বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা দুই ডাক্তারই আবার দেখে গেল। মিঃ সেন এখানেই সারাদিন থেকে গেলেন। কোর্ট থেকে ফিরেই রাজকুমার ও শিবুর মার কাছে শুনেই মল্লিও ইন্দ্র, দুজনে এসে হাজির হোল ব্রজেনবাবুর বাড়ীতে।

উর্মিলা জানলা থেকে দেখল মল্লিকা চিন্তিত মুখ করে মোটর থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। দেখে ছুটে গেল, "অমন মুখ করছিস্ কেন? সকালের চেয়ে মা অনেকটা ভাল। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন কালকে তাদের ওখানে মাকে সাবধানে নিয়ে যাওয়া যাবে। সবাই পরামর্শ করে এটাই ঠিক করা হয়েছে। এখানে আমি একা। বাবার উপর ত ঠিক ভরসা করা যায় না।

মল্লিকার দিকে তাকিয়ে উর্মি দেখল, ওর চোখ দুটো জলে চক্‌চক্ করছে। চিন্তা ও আনন্দের সংমিশ্রণ।

"সেটাই ঠিক হবে। আর শোন, আমি আজকে এখানেই থাকব। মাসী ভাল না হওয় পর্যন্ত ইন্দ্র আমার কাজ চালিয়ে নেবে," বলতে বলতে মল্লি এসে ঢুকল ওদের শোবার ঘরে।

ওকে দেখে মায়াদেবীর মুখে বড় একটা তৃপ্তির ছায়া পড়ল।

"তুই আছিস্? উর্মি একা সব দিক কি করে সামলাবে?"

"বাবা, মল্লি হচ্ছে সকলের একটা মাত্র সুপুত্র। আমি ত একটা মেয়ে। আমার উপর কি নির্ভর করা যায়?

কথাটা একরমভাবে বলল উর্মিলা, কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হোল, বেশ খুশী মনেই ও বলল।

সব শুনে মল্লি ও ইন্দ্রজিতের মনটা ঠাণ্ডা হতেই মনে পড়ল, ওরা কোর্ট থেকে বাড়ীতে ঢুকেই বেরিয়ে এসেছে। বলতে গেলে, ঘরের মধ্যেও ঢোকেনি। বাইরে শিবুর মা উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"উর্মি, খিদে পেয়েছে। তোদের চাকর মহাপ্রভু যে কি পদার্থ, আমার জানা আছে। ওকে চা করতে বল। ইন্দ্র, মোটরে করে গিয়ে ভাল দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসুক।"

উর্মিলা চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। ইন্দ্র গেল বেরিয়ে। মল্লি এসে মাসীর পাশে শুযে পড়ল।

"মাসী, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। সবাই মিলে কত গল্প করব দেখনা। জানো, তোমার কল্যাণে আমার ক'দিনের ছুটি হোল। বড্ড বিশ্রামের দরকার ছিল।"

মল্লিকে দেখে উর্মিলার মনে হোল, মল্লি পাশে থাকলে ওর কাছে সব কিছু সহজ হয়ে যায়।

পরের দিন সবাই মিলে সাবধানে মায়াদেবীকে নিযে এলো মল্লিদের বাড়ীতে। ইন্দ্রের পুরোণ চাকর যুধিষ্ঠিরের আসল কাজ ইন্দ্রের বই গুছিয়ে রাখা, নথি-পত্তর নিয়ে ওর সঙ্গে কোর্টে যাওয়া। ওকে পাঠিয়ে দিল উর্মিদের বাড়ী পাহারার জন্য।

মা ভাল হতেই উর্মিলার বাড়ী ফিরে এসেছে। সব আগের মত চলতে আরম্ভ হয়েছে। কলেজে যাওয়া গানের স্কুলে যাওয়া, ছুটির একদিন মল্লিকাদের ওখানে কাটানো। এরমধ্যে একদিন ও গিয়েছিল ডঃ গাঙ্গুলীর কলেজে।

"ডঃ রায়, আপনাকে যে আবার দেখতে পাব এত তাড়াতাড়ি আশা করিনি," হেসে বলছিল।

"ভেবেছিলাম ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে। জানেন, আমাদের বিধাতার কানটা বড় সজাগ। মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা ট্রেনে, ভবিষ্যতে আর নাও দেখা হতে পারে। কিন্তু এ দেখা থাকবে মনে চিরদিন, আর যোগাবে আনন্দ ও শান্তি। ভাবলাম এটাই বুঝি সত্য ধরে নিয়ে বিধাতা সত্যতে পরিণত করলেন।"

"কথা ত খুব বলতে পারেন। কেন? আমার ঠিকানা ত আপনার কাছে ছিল। খোঁজ করেছিলেন?" উর্মি বলেছিল।

"অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু উর্মিদেবী, সাহস পায়নি।"

"মানে?"

"ঠিক তাই। ভরসা পাইনি, হাওড়া স্টেশনে যেভাবে চলে গেলেন, মনে হোল, রাস্তার ধূলো ঘরে তুলতে চাননি।

"শুনুন, উজ্জ্বলবাবু, আপনি বড় সেন্‌সিটিভ্‌। বুঝতে পারলেন না দেখে যে, যিনি এসেছিলেন তিনি বড় ব্যস্তবাগীস টাইপ! তাই এই ক্রুটী। আমি কিন্তু একটু পরেই আপনাকে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম। রাজস্থানী দম্পতিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পেরেছিলাম।"

"মাপ চাইছি, ডঃ রায়, ভুল বুঝে পালিয়ে যাবার জন্য।"

"আপনাকে আর একবার মাপ চাইতে হবে।"

"আবার কেন?"

"কেন নয়? আমার ঠিকানা ছিল আপনার কাছে।"

"আবার মাপ চাইছি ভুল বোঝার জন্য," বলেছিল ডঃ গাঙ্গুলী।

"না, আমি, বোধ হয়, আগেই আপনাকে পাকড়াও করতাম। জানেন না ত কি ব্যস্ততার মধ্যে যে আমার কেটেছে। প্রথম ত ক'দিন গান রেকর্ডিং এর জন্য ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক তার পরেই মার শরীর খারাপ হোল। এই করে বেশ ক'দিন কলেজ কামাই হয়েছে। এখন কলেজের পরে ক্লাস নিয়ে মেক-আপ করে দিচ্ছি। কর্তৃপক্ষের কাছে কোন দায় নেই। কিন্তু যাদের পড়াই, তাদের কাছে আছে।"

"এ ধরণের কথা আপনার কাছে প্রথম শুন্‌লাম। ঠিক আছে। যে দিন বলবেন, সেদিনই যাব আপনার ওখানে।"

"বেশ, টেলিফোন করবেন। আসছে সপ্তাহে একদিন ঠিক করা যাবে।"

সেদিন ঊর্মিলার ছুটি। শীতের আমেজে মনে, শরীরে বেশ একটা খুশী খুশী ভাব। ছোট বেলার ফুরিয়ে যাওয়া দিনগুলো চোখের সামনে এলোমেলো ভাবে ভেসে উঠল।

টুক্‌টুকে লাল রিবণ মাথায় অর্গ্যাণ্ডীর ফ্রক পরে বাবার হাত ধরে চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা ধরতেন অনুপের হাত। দাদার হাতে থাকত খাবার বাস্‌কেট্।

সোনায় মোড়া দিনগুলো কেমন করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। দাদাটাই এরজন্য দায়ী। রইল বিদেশে। ওর জন্য কষ্ট পেতে মা-বাবার

মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ভেঙ্গে গেল। না হলে বয়সই বা কি? এই বয়সের লোকে চারিদিকে কত সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভাগ্যিস্, সেই আমেরিকান ছেলেটার হাত ধরে সে চলে যায়নি। তবে মা-বাবার কি হোত? কারো ত তাদের কথা ভাবা দরকার। না হলে চলবে কি করে?

পাওয়ার সময় পেলাম, দেবার সময় ফাঁকা। উর্মিলার ভেতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। এই পরিণতি সামনে রেখে কেন লোকে বিয়ে করে, সে বুঝতে পারে না। যদি শেষ পর্যন্ত বেশী বয়সে একক জীবনই কাটাতে হয়?

সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল, ওপথে সে পা বাড়াবে না। কি দরকার? শুধু মা-বাবার জন্য নয়, নিজের কথা ভেবেও সে এই সিদ্ধান্তে এলো।

সংসার পেতে না বসলে বাইরের থেকে সাহায্য, সহানুভূতি পাবার আশা থাকে। না হলে, সবাই ভাবে, ওর ত দেখবার লোক আছে। আমরা কেন ভেবে মরি।

না, এমন দিনে অযথা কতগুলো চিন্তা যা মনকে করে ভারাক্রান্ত, তা সে দূরে সরিয়ে রাখবে।

ঠিক করে ফেলল, আগের দিনের মত দুপুরে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে পিক্‌নিক বাসকেট হাতে মা-বাবাকে নিয়ে চলে যাবে চিড়িয়াখানায়। ঠিক আগের দিনের মত।

শুধু সামান্য একটু রদ বদল। তখন ছিলেন তাঁরা গারজিয়ান। তাঁরা ধরতেন হাত, যদি পড়ে যায়। আজ সেই জায়গাটা নেবে সে। কাঁধে ঝুলিয়ে নেবে বাস্‌কেট্। দু'হাতে ধরবে দু'জনকে। দাঁড়াবে গিয়ে একটার পর একটা খাঁচার সামনে।

সব চাইতে ভাল লাগে রং বেরং-এর পাখী দেখতে। মনে পড়ে যায় আকাশের রাম-ধনুর কথা। বাইরে রোদের আলো আঁধারি খেলা দেখে। আলোর নাচ দেখে মন তার উঠল নেচে। নৃত্যের তালে তালে। মনে হোল গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে নাচ শিখতে আরম্ভ করবে।

গানের দিকে, মনে হয়, কিছুটা এগিয়েছে। তাই এখন নাচ শুরু করতে ক্ষতি নেই। তার কত কিছু শিখতে ইচ্ছা করে। তাই সে করবে। জীবন ভোর শুধু শিখবে। জানবার, শিখবার কি শেষ আছে এই পৃথিবীতে ?

ফোনের আওয়াজে এমন সুন্দর চিন্তার জালটা গেল ছিঁড়ে।

ছয়

মা রান্নাঘরে। বাবা বাজারে। উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল, "কি ব্যাপার, ডঃ রায় ? গলার স্বরে মনে হচ্ছে মেজাজটা খুব সুবিধের নয়।"

ডঃ গাঙ্গুলীর গলা।

উর্মিলার বিরক্তিটা নিমেষে কেটে গেল, "ঠিক ধরেছেন। এমন মনোরম সকালটাতে আয়েসে বসে ভাবনার নৌকোতে দিয়েছিলাম পাল তুলে।"

"তাই ফোনটা বিরক্তির কারণ হোল ?"

"একদম ঠিক।"

"তবে ফোনটা রাখি, আপনি ফিরে যান আপনার সপ্তডিঙ্গিতে চড়তে।"

"দোহাই আপনার। এমন কাজটা করবেন না। খুব ভাল লাগছে আপনার ফোন পেয়ে।"

তার মানে. নির্ভয়ে একটা কথা বলতে পারি।"

"তথাস্তু।"

"থাকগে ভাবছিলাম আপনাদের ওখানে যাব, যদি অবশ্য আপনাদের কোন অসুবিধা না হয়।"

"আপনার বোন ?"

"তাই ত। আপনাকে ত বলা হয়নি। অনেক বলে কয়ে বোনটাকে রাজি করিয়ে একটা মাষ্টারমশাই ঠিক করেছি। আমাদের মতই বয়স হবে। স্কুলে পড়ান। ছুটীর দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা পড়ান। বাকি দিন-

গুলো আমি পড়াই। পরীক্ষার ত মাত্র কয়েক মাস বাকি। তাই আমার ছুটী।"

"তবে ত কেথাই নেই। তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে একটা নাগাদ এখানে চলে আসুন।"

"তারপর ?"

"গ্র্যাণ্ড একটা প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। আপনাকেই প্রথম বলি। এমন সুন্দর দিনে চলুন চিড়িখানায় ঘুরে বেড়াই গিয়ে। কি মনে হচ্ছে, জানেন ? বৎসরান্তে শীতের বেলা এসেছে। তাকে এমনি যেতে দেওয়া যায় না। এই যা - জাস্ট্ লাইক মি, ফোন ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তখন থেকে বকে যাচ্ছি।"

"আপনার কথায় আমারও শীতের হাওয়ায় যে শুধু গা শির শির করে উঠল, তা নয়, মনটাও নেচে উঠেছে।"

"যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম। বোনের চিন্তা নেই। ও পড়বে। আপনি চলে আসুন। আমরা চারজনে যাব।"

"আর দু'জন ?"

"আমার মা আর বাবা। জানেন, তাদের এখনও বলাই হয়নি। মনে মনে শুধু কথাটা ভাবছিলাম, আর এলো আপনার ফোন। এখন তবে ফোনটা রাখি ? দেরী করবেন না।"

"দেখবেন, সময়ের আগেই গিয়ে হাজির হয়েছি।"

উর্মিলা তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে, "মা, রাখ তোমার কাজ। আগে আমার কথা শোন। এইমাত্র ঠিক করেছি সবাই চিড়িয়াখানায় ঠিক আগের মত বেড়াতে যাব। সঙ্গে যাবে টিফিনের বাসকেট। এমন সুন্দর দিনটা। ভাল হবে না ?"

"বেশ হবে," মার মুখটা আনন্দে ভরে গেল।

তারপরই যেন একটু ম্লান হয়ে এলো। কেন তা উর্মি বুঝল। কিন্তু কিছু বলল না।

ভাইরা বোঝে না, একটা কালো পর্দা সব সময় মনের পেছনে ফেলে রেখেছে।

"তোর বাবাকে বলেছিস্ ?"

"না। সুযোগ হোল কোথায় ? যাক্, তার জন্য কিছু না। এখনি ত আসবে। তখন বললেই চলবে। দুপুরের খাবার বারটার মধ্যে খেয়ে তুমি ও বাবা একটু বিশ্রাম করে নেবে। আমাদের সঙ্গে ডঃ গাঙ্গুলী, যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ট্রেনে, উর্মিও যাবেন। এখনি ফোন করেছিলেন। বলে দিয়েছি আসতে। ভাল করিনি ?"

"খুব ভাল হবে। কিন্তু সঙ্গে খাবার কি যাবে ?

"সঙ্গে যাবে ডিমের স্যানড্উইচ্। রবি দুপুরের রান্না তাড়াতাড়ি করুক। আমি রুটী, মাখন, মিষ্টি, দু'রকম, সিঙ্গারা, ডালমুট আর ফল কিনে নিয়ে এখুনি আসছি। তুমি বাবা এলে প্ল্যানটা বোল।"

উর্মিলা গুণ-গুণ করতে করতে বেরিয়ে গেল,—

"শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন,

আমলকীর এই ডালে ডালে।"

ওরা যখন চারজন ট্যাক্‌সিতে চড়ে বসল চিড়িয়াখানার উদ্দেশে, তখন ঘড়িতে ঠিক একটা।

উর্মিলার মনে হোল মা-বাবা যেন সেই অনেক আগের দিনের খুশীতে ভরা মা-বাবা যাদের ওপর দিয়ে দুঃখের ঝড় ঝাপ্‌টা যায়নি।

বাবা বলে উঠলেন, "উর্মি, অত বড় বাসকেট্, তুই বাচ্চা মেয়ে কি করে পারবি নিতে ? দে আমার কাছে।"

উর্মিরও বেশ কয়েকটা বৎসর গেল খসে।

সে হেসে বলে উঠল, "বাঃ, আমি নিতে যাব কেন ? ডঃ গাঙ্গুলী ত রয়েছেন বোঝা বইবার জন্য।"

ডঃ গাঙ্গুলী হঠাৎ উর্মির দিকে ফিরে চাইলেন। উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন কথা কয়ে উঠল—ওটুকু বোঝা কেন ? সব বোঝা, সম্পূর্ণ বোঝা।

মুখে শুধু বললেন, "ঠিক কথা বলেছেন। আমি থাকতে……। দিন দেখি বাসকেটটা কায়দা করে ঝুলিয়ে নি কাঁধে। আর অন্য কাঁধে জলের ফ্লাস্কটা।

"মা, রাস্তা দেখে চল। শুধু খাঁচার দিকে তাকিয়ে চললে উল্টে পড়বে যে।"

"দেখ, উর্মি আমাদের কত বড় হয়ে গেছে। আর আমরা হয়ে গেছি কত ছোট। দেখেছ মায়া, আমরা যা বলতাম ওকে, ও‌ই এখন আমাদের তাই বলে", ব্রজেনবাবু প্রাণ খুলে হাসলেন।

ঘুরে ঘুরে চারজনে কত কিছু দেখল। কত কথা, কত দেখা, কত গল্প।

উর্মিলার বড় ভাল লাগছিল—মা বাবার ডঃ গাঙ্গুলীকে কত ভাল লেগেছে। আর ডঃ গাঙ্গুলীরও মা-বাবাকে।

বিকালবেলা ওরা বসে পড়ল ঘাসের উপর। খিদেও পেয়েছিল সকলের। এত খাবার সব শেষ হয়ে গেল। ডঃ গাঙ্গুলী গিয়ে রেষ্টুরেন্ট থেকে চা নিয়ে এলো।

খাওয়ার পরে মায়াদেবী আর ব্রজেনবাবু বসলেন আরাম করে একটা বেঞ্চে।

"যাও তোমরা তু'জনে বাকি যা আছে দেখে এসো। আমরা তু'জনে এখানে বসলাম।"

তু'জনের চলে যাবার দিকে তাকিয়ে ব্রজেনবাবু বললেন, "জান মায়া, সব বাবা-মাই দিনের শেষে এই রকম দিনটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পড়ন্ত বেলায় দেখবে, তাদেরই সৃষ্টি, তাদেরই পালিত যারা, তারা তাদের ঘিরে আনন্দ করবে তাদের একপাশ করে দূরে রাখবেনা। সেই তৃপ্তি, সেই সুখ। দিচ্ছে আমাদের উর্মি।"

"ঠিকই বলেছ। সকালে উঠে ভগবানের কাছে যখন প্রার্থনা করি, সবার আগে উর্মির কথা মনে আসে যদিও ভাল আমি বাসি সবাইকে।"

ডঃ গাঙ্গুলী ও উর্মি চিড়িয়াখানার সন্ধানে না গিয়ে বসল এসে জলের ধারে একটু নিরিবিলি জায়গায়।

"অনেক ত দেখা হোল। বরঞ্চ এখানে বসে একটু গল্প করা যাক। কি বলেন ডঃ গাঙ্গুলী?"

"আমার ও বারে বারে তাই মনে হচ্ছিল। বলিনি। চিড়িয়াখানা

ত কতবার দেখেছি, কতবার দেখব, কিন্তু আজকের এই মুহূর্তটা কি আর ফিরে আসবে? না, যা যায় তা আর ফিরে আসে না।"

একটু থেমে উজ্জ্বল বলল, "ট্রেনের সেই দীপ্তিময়ী মূর্তি ভাবলে এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি জানি, অনেক বৎসর পরও তা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। কিন্তু সেই পরিস্থিতি ত আর আসবে না। সেটা ছিল ভয়াবহ দৃশ্য। এটা হচ্ছে মনোরম দৃশ্য। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ভরা দিন, সুখের আবেশ মোড়া দিন। তা কি আর আসবে বা আসতে পারে? তাই চুপ করে বসে এই দৃশ্যের মধ্যে আপন চোখের লেন্সে, মনের পর্দায় ধরে রাখবার চেষ্টা করি। যখনই ইচ্ছে হবে, মনের চোখে তা দেখব।"

ডঃ গাঙ্গুলীর কথা শুনতে বড ভাল লাগছিল উর্মির। তাকে ভাল লেগেছে স্থুলতার মধ্যে দিয়ে নয়। শরীর দিয়ে শরীর পাওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টায় নয়, মন দিয়ে মনকে পাওয়া। আসলের সঙ্গে আসলের পরিচিতির চেষ্টা, যা পেলে সবই পাওয়া হবে।

চেয়ে দেখল উর্মি, উজ্জ্বল সত্যি চোখ বুজে বসে আছে।

হঠাৎ মনে হোল, তারও বড় ভাল লাগছে উজ্জ্বলকে।

চিন্তার ধারা, মনের ধারা অনেকটা এক।

তবে কি তার মন চাইছে একে ভালবাসতে? না, তা কি করে হয়? না তার দিক দিয়ে, না ওর দিক থেকে।

দু'জনেরই রয়েছে বন্ধন যা এড়িয়ে যাবার সাধ্য তাদের নেই। এসব কি ছেলে মানুষী কথা তার মনে দিচ্ছে উঁকি? আসলে, এই মায়াময় পরিবেশ মনকে এমনি করে দেয়। তা সাময়িক। অতি সাময়িক।

"আচ্ছা উজ্জ্বলবাবু, আপনি কি আঁকেন?"

"না ত। কখনো চেষ্টা করিনি।"

"করলে কিন্তু খুব ভাল পারবেন।"

"বোধহয়, ঠিক কথা বলেছেন। মনে মনে কল্পনা আছে যদি বোনটা ভাল করে পাশ করতে পারে এবং আরো কিছুটা দূর এগোতে পারে, তবে বাচ্চাদের একটা স্কুল করে দেব। তা নিয়েও যখন ব্যস্ত

থাকবে তখন আমি আঁকা শিখব। ডঃ রায়, একটু বড় হতেই ভগবান দায় দায়িত্ব এমনভাবে মনের মধ্যে চাপিয়ে দিয়েছেন যে এর বাইরে জগৎ আছে তা বুঝতে পারি নি। চোখ খুলে বোধহয়, দেখবার চেষ্টাও করিনি।"

যেন নিজের মনেই সে বলল—'আজকের মত একটা দিন যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, তা কি আমি জানতাম? এ যেন একটা নিখুঁত মুক্তো যা যত্নে তুলে রাখতে হয়। না হলে, যে তা যাবে হারিয়ে'।

"আপনি কি সুন্দর বলতে পারেন। আমি কিন্তু পারি না, উজ্জ্বলবাবু। আমি পারি ভাবতে"।

"আমিই কি ছাই পারতাম বলতে? আপনিই আমাকে বলাচ্ছেন।"

উর্মিলার হঠাৎ মনে হোল, ফেরার সময় হয়ে এলো। গেট বন্ধ হবে। মা-বাবা বোধ হয় এদিক সেদিক তাকাচ্ছে তাদের উর্মির সন্ধানে।

"চলুন ডঃ গাঙ্গুলী, ওঠা যাক। সময় হয়ে গেছে। বাড়ী গিয়ে সবাই মিলে গল্প করা যাবে।"

তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল ওরা। উর্মিলা এ ধরনের কথা আর শুনতে চায় না। ও কোন বন্ধনের মধ্যে জড়াতে রাজি নয়।

বাড়ী ফিরে সেদিনের সন্ধ্যেটা বড় সুন্দর কেটেছিল। ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবী ডঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কত সুখ দুঃখের গল্প করলেন। যার যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়েও হোল আলোচনা।

অতীতে যা হয়েছে তা শুধু কথার মধ্যে ও স্মৃতির মধ্যে থাকে। তা ভাল মন্দের বিচারের বাইরে। তা যে গত, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তা যে সয়ে যেতে হবে নিঃশব্দে।

বর্তমানের মধ্যে রয়েছে কিছু শব্দ, কিছু নিঃশব্দতা।

আর ভবিষ্যৎ? তা একেবারেই অজানা। তাই তাকে নিয়ে রয়েছে আনন্দ, নিরানন্দ। তাকে নিয়ে তুমি সাজাতে পার যেমন তোমার মন

চায়। তার মধ্যে তৃপ্তির পথ আছে। তাইত ভবিষ্যৎ চিন্তাকে বলে স্বপ্নবিলাস। তাই ত মানুষের তা বড় প্রিয়।

মন যা চায়, সেই দিকে তাকে নিয়ে যেতে পারে। সেখানে মানুষই স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তা সেখানে নির্জীব।

ঊর্মিলা বসে বসে এই সব ভাবছিল। এদের তিন জনের আলাপ আলোচনাতে সে যোগ দিচ্ছিল না। সে শুধু শুনে যাচ্ছিল।

মা বাবা তাকে নিয়ে তাদের মন যা চায় সেই ভাবে কল্পনার কথা উজ্জ্বলবাবুকে বলে যাচ্ছিল।

ঠিক সেই রকম ডঃ গাঙ্গুলীও তার বোনকে নিয়ে। এর ওপর নিয়তি তার নির্মম হাত চালাতে পারে নি। যদি পারত, তবে নিশ্চয়ই তা সে দিত ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে।

এটুকু নিয়ে মানুষ বাঁচে। এটাই যে তার সঞ্জীবনী সুধা।

হাতের ঘড়টার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে ঊর্মিলা কথা বলল, "উজ্জ্বলবাবু, আপনার বোধ হয় বাড়ী যাবার সময় হোল। বোনটা একা পড়ে আছে আর তোমাদের দুজনেরও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া দরকার।"

"সত্যিই ত। আমি কথায় কথায় ঘড়ির দিকে নজর দিইনি। আমি এখন চলি। বড় অপূর্ব কাটল দিনটা।"

"আবার এসো" ব্রজেনবাবু বললেন।

ঊর্মিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ডঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে।

চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নীল আকাশে তারাগুলোকে মনে হচ্ছে চন্দনের বিন্দু। ডঃ গাঙ্গুলী একবার তাকাল আকাশের দিকে, একবার ঊর্মিলার মুখের দিকে। কোন্‌টা বেশী সুন্দর?

মনের মধ্যে যাই স্থির করে থাকুক, মুখ ফুটে কিছু বলল না। তার মনে হোল, ঊর্মিলা তুলনার বাইরে। ওকে কিছু চট্‌ করে বলা যায় না।

তাই শুধু বলল, "ডঃ রায়, এমন দিন দুর্লভ।"

উর্মিলারও তাই মনে হয়েছিল। বাইরে কিন্তু অন্য কথা বলল, "কি যে বলেন উজ্জ্বলবাবু। সুলভ করতে মাত্র কটি জিনিষের প্রয়োজন —মা-বাবার শরীর ঠিক থাকা, আমাদের ছুটি আর আগের এনগেজমেণ্ট না থাকা। ব্যাস্। কি এমন শক্ত, বলুন ত? দাঁড়ান, খুব শিগ্‌গির আর একটা প্ল্যান করে আপনাকে খবর দেব"

ডঃ গাঙ্গুলীও মনের ভাবটা ঘুরিয়ে উর্মির কথায় তাল দিল, তার মানে, আপনি ফোন না করা পর্যন্ত উজ্জ্বল নামক ব্যক্তিটির এ বাড়ীর নম্বর ডায়েল করা নৈব নৈব চ।"

"বারে। তাই বুঝি বললাম? আপনি, একবার কেন, একশ বার ফোন করবেন। অবশ্য ফোনের যা অবস্থা।"

আর বিশেষ কোন কথা হয়নি। ঠাণ্ডাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা মোটেই আরামদায়ক লাগছিল না।

উর্মিলার জীবনটা অনেকটা ছকে আঁকা। সকালে উঠে সংসারের কাজ যতটা পারে গুছিয়ে দেয়, মাকে রেহাই দেবার জন্য। তারপর ট্রামে-বাসে কলেজে পৌছান, মনে হয়, এটাই বুঝি সব চাইতে বড় ও শক্ত কাজ। বিকালে কলেজেই হাত মুখ ধুয়ে কাছের একটা রেস্টুরেণ্টে চা, ইত্যাদি কিছু খেয়ে হয় গান শিখতে বা নাচ শিখতে যায়।

এমনভাবে সে ব্যবস্থা করেছে, যাতে শনি, রবি—এই দুটি দিন তার না যেতে হয় কলেজে, না গানে, না নাচের পেছনে। এ দুটি দিন বাড়ীতে থেকে সে কলেজের খাতা দেখে, পড়াশুনা করে, গান প্র্যাকটিস করে, বাড়ীর যাবতীয় কাজ করে। যাকে বলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ।

একটা সন্ধ্যা ত মল্লিদের সঙ্গে সকলে মিলে আনন্দ করা। থাকে একটা দিন। সে দিনটা কি করে কাটাবে ভাবতে সে নেয় অনেক সময়। যক্ষের ধনের মত। এটা ভাবে, সেটা ভাবে।

সপ্তাহে এই একটা দিন হচ্ছে তার নিজস্ব।

কোন দিন সে মা-বাবাকে নিয়ে সিনেমা দেখে। কোনদিন

তার সহকর্মীদের ডাকে চা খেতে। তাদের মধ্যে ছেলেও থাকে, আবার মেয়েও থাকে।

নাচ ও গানের কল্যাণে তার অনেক পুরুষ বন্ধু আছে। তাই পার্টিটা বেশ মেলান মেশান হয়।

মা-বাবাও জয়েন করতে পারেন। না হলে সে আনন্দ পায় না। সেটা তার বন্ধু বান্ধবীরা বোঝে। সেটাও বোধহয় একটা বড় কারণ যার জন্য ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবী উর্মিকে নিয়ে থাকতে চান।

অনুপ বা বনানী, দু'জনেই ভাল ও ওদের ভালবাসে। কিন্তু হলে কি হবে, তাদের সব 'এজ গ্রুপ'কে সমান ভাবে মাতিয়ে রাখার সেই শক্তি আছে। ছোট, বড়, সবাইকে দিতে পারে আনন্দ। তার নিমন্ত্রিতরা তাই এত আনন্দ পেয়ে যায়।

অনুপ, বনানী তা পারে না। ওখানে কোন অসুবিধা না থাকলেও কেমন একটা আড়ষ্টতা থাকে। তাই, তাদের কাছে গেলেও ওরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

অনেক সময় নিজেদের মধ্যে কথা হয়।

"মায়া, এখন উর্মিলা এ রকম বিয়ে করলে কি ঠিক এই ভাবটা থাকবে ?"

"আমার মনে হয় থাকবে। মানুষের পরিবর্তনের একটা বয়স আছে। উর্মি আমাদের সেই বয়স পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া এত দুঃখের পরেও যখন দাঁড়াতে পেরেছি, তখন আমরা ঠিকই চলতে পারব, যতদিন বাঁচব।"

অনেক দিন উর্মি আর ড: গাঙ্গুলীকে আসতে বলেনি। টেলিফোনে অবশ্য কথা হয়। তা ছাড়া বোনের পরীক্ষা নিয়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত ছিলেন।

নিজেরও প্রায় তাই। নিজের পরীক্ষা না থাকলেও ছাত্রীদের পরীক্ষা, খাতা দেখা সব নিয়ে দিনগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বিধাতা ব্রেক্ কষলেন।

পুজো পুজো রব উঠল চারিদিকে। ঠিক হয়েছে, মল্লি ইন্দ্রজিৎ

অবিনাশবাবুকে নিয়ে ছুটি কাটাতে যাবে জব্বলপুরে। ইন্দ্রজিতের মা-দাদারা এখানে আছেন। কিছুদিন আগে মল্লির শাশুড়ী এসে থেকে গেছে মল্লিদের কাছে। ইন্দ্রজিতের পরিবারের প্রত্যেকেই বড় ভাল। এমনটা বড় একটা দেখা যায় না।

অবিনাশবাবুর যদি মল্লির সঙ্গে না যান, তবে ইন্দ্রজিতের দাদা এসে নিয়ে যায়।

একবার সেই রকমই হয়েছিল। অবিনাশবাবু যান নি। ঠিক হয়েছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই উর্মিরাই বাড়ী বন্ধ করে গিয়ে থাকবে মল্লিদের বাড়ীতে। সব প্ল্যান আপসেট্ করে ইন্দ্রজিতের দাদা এসে অবিনাশবাবুকে ধরে নিয়ে গেল। সেই থেকে এই ভুল অবিনাশবাবু করেন না।

বৎসরে একবার ওদের সঙ্গে যান জব্বলপুর। তারপর সবাই মিলে ওরা এদিক সেদিক বেড়াতে যায়। কখন কখন ওখানেই সকলে মিলে আনন্দ করে।

উর্মিলা আশা করেছিল অনুপরা আসবে। অনুপ জানিয়েছে, এ বছর আর ওদের আসা হবে না। কারণ ওরা যাচ্ছে দিল্লীতে সুহাসদার ওখানে।

মা-বাবাকে দেখেই উর্মি বুঝতে পেরেছিল, ওদের মনে লেগেছে। কলিকাতা ওদের কাছে খালি লাগবে। অবিনাশবাবু চলে যাবেন। বাণীদেবীও দিল্লী যাচ্ছেন। উর্মিলা অবশ্য কলকাতাতে কোন দিনই একলা বোধ করে না। তার নিজস্ব ভাবনার রাজ্যেও কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাছাড়া গুচ্ছের চেনা জায়গা। তারা বন্ধুস্থানে পড়ে না অবশ্য।

বন্ধুস্থানে, সারা জীবনে, দু'চার জনের বেশী সংখ্যা কি হয় বা হতে পারে।

অনেক দিন পরে হঠাৎ শম্ভুনাথ মল্লিকের কথা মনে হোল। বেশ কয়েক মাসের জন্য কাজে ওকে মাদ্রাজ যেতে হয়েছে?

চিঠি লিখতে ওর গায়ে জ্বর আসে। তার উপর ওর সময়টা,

যাকে বলে কাজে ঠাসা। তাই ও না করে দিয়েছিল। শম্ভুনাথ কথা রেখেছে। কথা আছে, কলকাতায় এসে ওর উপস্থিতিটা ফোনে জানাবে।

ওর খুব ইচ্ছে করছিল, ক'দিনের জন্য হলেও মা-বাবাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে যেত। মা-বাবা বড় খুশী হবেন। তার সব বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে, মনে হয়, দু'জনেই ডঃ গাঙ্গুলী আর শম্ভুনাথ মল্লিককে বেশী পছন্দ করে ও।

একা দু'জনকে নিয়ে কলকাতার বাইরে, মানে অজানা জায়গাতে যেতে ভরসা হয় না। এখানে বাড়ীর পাশে ডাক্তার। তাছাড়া অবিনাশ মেসোরা ছাড়াও কিছু চেনাজানা লোক আছে। বিশেষ করে বাবা। হার্টের ব্যাপার বলা ত যায় না কিছু।

ডঃ গাঙ্গুলীকে ঠিক বলা যায় না। বোনটি রয়েছে। বললে, বোধ হয়, বোনের ব্যবস্থা করে সঙ্গে যাবেন। কিন্তু, কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। তাছাড়া বেশ অনেক দিন হোল ওকে আসতে বলেনি। ইস্, এখন যদি মিঃ মল্লিক থাকত ত বেশ হোত।

তাইত ওর ত আসার সময় হয়ে গেছে! বেশ হয়, যদি চলে আসেন। উঠে গিয়ে ওর ফ্ল্যাটে টেলিফোন করল। বেয়ারার কাছে জানল, বার দিন পরে ফিরছে।

ভালই হোল। চার পাঁচ দিনের মধ্যে মল্লিরা চলে যাবে আর রাণী মাসীও। তারপর কয়দিনের মধ্যে মিঃ মল্লিক ফিরে এলেই ব্যবস্থা করতে হবে। মা-বাবাকে নিয়ে ভুবনেশ্বরে দিন পনরর জন্য যেতে হবে। পুজোর পরে পনেরটা দিন কলকাতাতে কাটানো যাবে।

মনে মনে প্ল্যান করে একটা শান্তি পেল। তার যত ভাবনা মা-বাবাকে নিয়ে। নিজের মনে হাসি পেল ভেবে, সত্যি ও নিজে যেন কি রকম। কাউকে তার প্রয়োজন নেই বা কেউ না হলেও তার চলবে। এই রকম মনটা যদি তার চিরকাল থাকে ত বেশ হয়।

সাত

ওরা সবাই মোটরে ঠেসে ঠুসে হাওড়া ষ্টেশনে মল্লিদের ট্রেনে তুলে দিতে চলে গেল। আগের দিন দিয়েছে তুলে বাণী মাসীকে দিল্লির ট্রেনে। মল্লিরা যাবার আগেই ওর প্ল্যানের কথা ওদের জানিয়েছিল।

"ভাল হবে খুব। একলা কিন্তু মাসী-মেসোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়িস না। মিঃ মল্লিককে নিয়ে গেলে ভাল হবে। গরমের ছুটীতে সবাই আমরা একসঙ্গে বের হব।"

মোটর ও ড্রাইভার রেখে গিয়েছিল উর্মির হাতে। কপাল গুণে মল্লিরা যাবার পর-দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেল শম্ভুনাথের ফোন।

"উর্মিলাদেবী, আমার কি ভাগ্য বলুন ত? বাড়ীতে ঢুকেই বেয়ারার কাছে শুনলাম, আপনি ফোন করেছিলেন আমার আসার খবরের জন্য।"

উর্মিলারও ভীষণ ভাল লাগল ফোন পেয়ে।

"সত্যিই, আমি ফোন করেছিলাম। কতদিন আপনার সঙ্গে দেখা নেই। প্রায়ই বাবা-মা জিজ্ঞাসা করেন। কি করছেন আজকে?"

"আপনি হুকুম দিলে আফিস্ যাব না।"

"কি চালাক আপনি? আফিস্ যাবেন কি করে? সে ত বন্ধ।"

"ঈস্, ভাবলাম আপনাকে খুশী করতে পারব। তা আর হোল না। শুনুন, আপনারও ত ছুটী। চলুন, আপনার মা-বাবাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যাক। তারপর একসঙ্গে ঘোরা যাক বা সিনেমা দেখা যাক। আপনি যা ঠিক করবেন।"

"বেশ ত। আমরা রেডিই থাকব।"

"মল্লি ইন্দ্রের খবর কি?"

"ওরা ত গতকাল জব্বলপুর চলে গেল মেসোকে নিয়ে। বাণীমাসীও তার আগের দিন দিল্লি গেল।"

"আপনার বাবা-মা ত একটু একা পড়ে গেছেন ?"

"কেন ? আমরা আছি কি করতে ?" বলে উর্মি হাসল। "আচ্ছা তাড়াতাড়ি আসুন", উর্মি ফোনটা রেখে দিয়ে হেসে ফেলল।

বাছাধন ত জানে না—ওর জন্য একটা বিশেষ কাজ, প্ল্যান করে রেখেছি। তারপর ভাবল, এতে ও নিশ্চয়ই খুশী হবে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে রান্না করা বন্ধ করল।

"শোন, মিঃ মল্লিক এসেছেন। আমাদের সবাইকে বাইরে লাঞ্চ খেতে নিয়ে যাবেন, বললেন। একটু পরেই আসছেন। তোমরা রেডি হও।"

"আমাদেরও ওকে কিছু করা উচিত। কি বল ?" মায়াদেবী বললেন।

"সে জন্য তুমি ভেবো না।"

বাইরে মোটর আসার আওয়াজ পেয়ে ব্রজেনবাবু সহাস্য মুখে গেলেন এগিয়ে, "এসো এসো শম্ভুনাথ। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। অবিনাশ চলে যাওয়াতে মনটা খারাপ লাগছিল। তুমি বড় ঠিক সময়ে এসে গেছ। জান ত, অবিনাশ যে শুধু আমার বন্ধু, তা নয়। ওযে আমার আপনজন।"

"তা ত ঠিকই বলেছেন। আপনাদের বন্ধুত্ব দেখলে এক এক সময় হিংসে হয়। এত সৌভাগ্য কি আমার হবে ?"

শুনে ব্রজেনবাবুর মুখে একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল।

"তা যা বলেছ। এই বন্ধুত্বের শুরু কি আজকের। কত কাল হয়ে গেল। এখন কি ভয় হয় জান ? কাউকে যদি বেশী দিন একলা থাকতে হয়।"

"এখন এ সব কথা কেন ভাবছেন, মিঃ রায় ? এখনো আপনারা অনেক দিন দু'জনে আমাদের মধ্যে থাকবেন।"

শম্ভুনাথ এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। ওর দিকে তাকিয়ে ব্রজেন রায়ের খেয়াল হোল, একটা বাজে। এর ত সময়ে লাঞ্চ খাবার অভ্যেস।

তাই ডাকলেন, "উর্মি, আয়। শম্ভুনাথ এসে গেছে। একটা বাজে।"

মিঃ মল্লিক এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল খাবার তাড়া দেবার জন্য মোটেই নয়। উর্মিকে দেখবার জন্য।

পাঁচ মাস পরে দেখবে। প্রত্যেকটা দিন ওর কথা ভেবেছে। ওকে মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি এক দিনের জন্যও।

এত বছর প্রায়ই দেখা হয়েছে বলেই, বোধ হয়, উর্মি যে তার মন কতটা জুড়ে আছে বুঝতে পারেনি।

তার জীবনে পার্টির অন্ত নেই। নেই সুন্দরী মেয়েদের সাহচর্যের অভাব। বন্ধু-বান্ধবদের স্ত্রীরা সকলেই স্মার্ট, শিক্ষিতা, সুন্দরী। চলনে, বলনে, বসনে একেবারে একালের। খাটো করে কাটা চুল হেলিয়ে, ওয়াইন গ্লাস হাতে যখন কথা বলে, তখন ভাল না লেগে পারে না।

তার উপর আছে কুমারী বোনেরা বা শালীরা।

প্রথম দিকে এদের ব্যূহ থেকে অক্ষতভাবে সে বেরিয়ে এসেছে তার চলে যাওয়া স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার জোরে। এখনও কিছুটা তাই। তার সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে উর্মিলা।

উর্মিলা তাদের মত আলট্রা স্মার্ট নয়, কিন্তু তবুও তার আকর্ষণ সবাইকে পিছে ফেলে রেখেছে। স অনেক ভেবে দেখেছে, এর কি কারণ হতে পারে।

বোধ হয় উর্মিলার উদাসীনতা।

আবার সোজা ভাবে তাও বলা যায় না। এমন ভাবে কথা বলে, ব্যবহার করে যেন কত কাছের লোক। আবার বেশী এগিয়ে যাওয়া যায় না। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য দাঁড়ি টানা আছে। অদ্ভুত মেয়ে।

আর যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের ব্যবহারে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বুঝি ওরা মিশছে। শুধু মেশার জন্য মিশছে না। সাহচর্য ভাল লাগে বলে নয়। আরও কিছুর জন্য।

উর্মির হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তার সঙ্গে কথা বলে, বেড়িয়ে, সময় কাটিয়ে। তার পেছনে নেই কোন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

এক এক সময়, মনে হয়, ওর মনে কি কিছু দাগ কাটে ? বোধ হয়, এ যেন নদীর স্রোতের মত বয়ে চলেছে আপন মনে।

উর্মিলার কণ্ঠস্বরে মল্লিকের ভাবনার মোড় গেল ঘুরে।

"বড দেরী হয়ে গেল, না ? কিছু মনে করবেন না। প্লিজ্। আমি মাকে ডেকে নিয়ে এখুনি আসছি।"

শম্ভুনাথ কিছু বলবার সুযোগ পেল না। বিদ্যুতের মত এক ঝলক দেখা দিয়ে আড়ালে চলে গেল।

মোটর হু হু করে ছুটে চলেছে চৌরঙ্গীর দিকে। মানে গন্তব্যস্থল হচ্ছে পার্কষ্ট্রীট্। যা কিছু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন খাবাব জায়গা, সব জটলা পাকিয়েছে ছোট এক পরিসরের মধ্যে।

"কোথায় ঢুকব মিঃ রায়, বলুন ত। আপনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই প্রথম হচ্ছে আপনার চয়েস্।"

"বেশ, আমি বলি কি, আজকে চাইনিজ্ খাওয়া যাক, যদি কারো আপত্তি না থাকে।"

"কি আশ্চর্য ! দেখুন, আমিও ঠিক এই ভাবছিলাম," শম্ভুনাথ বলে উঠল।

"আমি কিন্তু কোন কিছুই ভাবছিলাম না। তবে বাবার কথায় সর্বান্তঃকরণে সায় দিলাম," উর্মি বলে উঠল।

"আমি কিন্তু বাপু তোমাদের মত গুছিয়ে বলতে পারলাম না। তাই শুধু বললাম বেশ ত।"

"মা, জান, তোমার বলাটাই সবচাইতে মিষ্টি হোল। এটাই ত হোল সত্যিকারের বলার ক্ষমতা। সহজ, সরলভাবে মনের কথা বলা।"

সবাই এসে ঢুকল একটা ভাল চীনা খাবারের জায়গাতে। খেতে খেতে ঠিক হোল, সন্ধ্যাবেলা যাবে গঙ্গার ধারে। তারপর বাইরে হাল্কা ডিনার খেয়ে বাড়ী ফিরবে। মাঝখানে অবশ্য বাড়ী এসে একটু বিশ্রাম করে যাবে।

"রাতের খাওয়াটা কিন্তু, শম্ভু, আমরা খাওয়াব," মায়াদেবী বললেন।

"তা হয় না। আজকের দিনটি আমার। কতদিন পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা হোল। কালকে আপনার বাড়ীতে দুপুরে খাবো।"

"বেশ. তুমি যা বললে, তাই হবে," মায়াদেবী সায় দিলেন।

ঊর্মিলা ওর বাবাকে কি জানি বলছিল, আর দু'জনে মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

"ডঃ রায়, আপনি কি এমন কথা বলেছেন, যা থেকে মিসেস রায় ও আমি বঞ্চিত হব ?"

এই কথার পরে চাপা হাসিটা একটু জোরেই হয়ে গেল।

"এমন কিছু নয়। আমি বাবাকে বলছিলাম, আপনার হচ্ছে শুধু খাবার চিন্তা। প্রথমেই চব্বিশ ঘণ্টার খাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।"

"আমাকে আপনি তাই মনে করেন ? আপনার মা তুললেন কথাটা। তাইত বললাম," শম্ভুনাথকে যেন কেমন গম্ভীর দেখাল।

"বেশ যা হোক। ঠাট্টা করলাম বুঝলেন না ? বেশ, এখন থেকে গুরুগম্ভীরভাবে কথা বলব।"

ঊর্মিলার কথা শুনে মেঘ কেটে গেল।

"না, না। তা কেন ? আমি ত আবার একটু মেঠো ধরনের লোক।

ব্রজেনবাবু ততক্ষণে অন্য কথা পেড়ে দিয়েছেন। যাকে বলে সাময়িক রাজতন্ত্র, মন্ত্রিতন্ত্র। গণতন্ত্রও বাদ গেল না। এসব আলোচনা, আজকাল এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সকলেই সব জানে, সকলেই যোগ দিতে পারে।

তাই ঊর্মিলা ভাবছিল—এসব যে যুগে ছিল না, তখন লোকেরা না জানি কি করত।

কথা বলার তেমন যুৎসই কিছু না থাকলে কিসের উপর কথা চালাত ? না, বোবা হয়ে থাকত ? তাই ত আজকাল কখনও কাউকে চুপ করে থাকতে হয় না। ধরাবাঁধা কতগুলো বুলি আছে। বকে চললেই হোল।

খাওয়াটা ভালই হোল। বেরিয়ে এসে ঊর্মিলা বলল, "আজ ত

মল্লিক সাহেবের দিন। তাই বলছি, সবাইকে ভাল মিঠে পান খাওয়ান ত।"

"নিশ্চযই, নিশ্চযই," রাস্তায় মোটর থামিয়ে শম্ভুনাথ ভাল দোকান থেকে মিষ্টি পান নিয়ে এলো।

"শুধু পান হলেই চলবে, সাহেব? বিকালে চায়ের জন্য এক রকম মিষ্টি, আর এক রকম নোন্তা কিনুন।"

"কি হচ্ছে দুষ্টুমি, উর্মি। চা ত বাড়ীতে খাওয়া হবে?

"তা ত হবে। কিন্তু তার সঙ্গে ও টা'র দরকার। তাছাড়া, কালকের দিনটি, মা, তোমার। তখন কিন্তু খুটিনাটী সব তোমায় ম্যানেজ করতে হবে। কি বলেন শম্ভুবাবু?

উর্মি সত্যি সুন্দর কথা বলে। গাড়ীর তিনজনের মনেই সেই কথাটা এল। মুখে অবশ্য কেউ কিছু বলেনি।

বাড়ী এসে ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবী চলে গেল বিশ্রাম করতে। এটা হচ্ছে উর্মিলার কড়া হুকুম। দুপুরে দু'জনকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে।

উর্মিলা ভাবে, বাবা মা দু'জনেই আস্তে আস্তে যেন কেমন তার ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে সব বিষয়ে। নিজে কিন্তু একটা বিষয়ে মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মাসের প্রথমে মাইনে পেয়ে পাই-পয়সা শুদ্ধ মার হাতে তুলে দেয়। মায়াদেবীই জোর করে, উপরি, মানে, এক্সট্রা টাকা যা সে পায়—পরীক্ষার পেপার কারেক্ট করে ও রেকর্ড থেকে, তা ওর হাতে রাখতে বলেছে।

উর্মিলা ভাবে, সত্যি, মার মত কি কেউ হয়? মাসান্তে যা থাকে, তা আবার উর্মির নামে ব্যাঙ্কে রাখে। শত মানাতেও এর পরিবর্তন করতে পারেনি। কিছু বললেই বলে, তুই ত আমার ব্যাঙ্ক। আমার আলাদা ব্যাঙ্কে ত কোন দরকার নেই।

দুপুরে দু'জনে বসে ঠিক করে ফেলল, দিন দশেকের জন্য ভুবনেশ্বরে যাবে।

উর্মিলা বলতেই শম্ভুনাথ এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

"কি কইনসিডেন্স দেখুন। আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে ভুবনেশ্বরে। কতবার বলেছে আমাকে যেতে। যাওয়া হয়নি। একা কি যাব? দিন দশেকের জন্য সবাই মিলে ঘুরে আসা যাক্।"

"একা কেন? আপনার বোন ভাইয়েদের নিয়ে বা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে? আপনার ত বন্ধু-বান্ধবীর অভাব নেই।"

"কথাটা ঠিক বলেছেন। তবে মা-বাবা যাবার পরে ভাই-বোনেরা নিজেদের নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত। মা-বাবার অভাবে অনেক জায়গাতে তা দেখা যায়। বন্ধনটা শিথিল হাত থাকে। আর বন্ধু-বান্ধবীর কথা বলছেন? সবই ওপর ওপর। আপনাদের সঙ্গে বা ইন্দ্র-মল্লর সঙ্গে যতটা নৈকট্য আছে, তা কি কারো সঙ্গে আছে?"

"তা বটে। সত্যিকারের বন্ধু আর ক'জন থাকে।"

"শুনুন, একটা রফা করে ফেলা যাক। এত ভাল লাগছে সবাই মিলে যাব বলে। আপনাদের লোকটাকে সঙ্গে নিন। আসা যাওয়ার খরচ আমার, আর ওখানে এদিক সেদিক দেখার। আপনার ওপর সকলের ভোজন পর্বের।"

"মিছি-মিছি আপনি এত খরচ কেন করবেন। আমি করব ভেবে রেখেছি।"

"বেশ ত। অন্য সময় করবেন। এই আনন্দটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। জানেন ত, দাদা ও বোনেদের জন্য যথেষ্ট খরচ করেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি, আমাকে দেখলেই ওদের মনে পড়ে টাকার কথা। আমি যে বড্ড বেশী রোজগার করি। তাই মনে ব্যথা পাই। বোঝে না, টাকা ত দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই দেব; কিন্তু আমারও ত কিছু প্রাপ্য আছে। আমারও ত কিছু চাইবার আছে, হঠাৎ চুপ করে গেল শম্ভুনাথ।

—"দেখুন কি কাণ্ড, কত কথা বলে ফেললাম যা থাকে চাপা মনের মধ্যে।"

ওর কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন মায়াবোধ করছিল উর্মিলা। সকলেরই মনের মধ্যে কোন দুঃখ রয়েছে। কারো বেশী, কারো কম।

সর্বাঙ্গীণ সুন্দর জীবন বুঝি মানুষের হয় না।

সেদিন দুপুরবেলা.শম্ভুনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হোল, ওকে চিনতে কি ভুল করেছে? ওর বাইরের আচরণে ধরা পড়ে অসহিষ্ণুতা, চঞ্চলতা, আর সাময়িক সব কিছুর ওপর আকর্ষণ। বড় বড় পার্টির গল্প। ও যে সব পার্টি দেয়, তাতে যেতে কতবার ঊর্মিলাকে বলেছে।

"দেখবেন, আপনার খারাপ লাগবে না। আলাদা, অন্য রকম আব-হাওয়া। আপনি যেমন ভাবুক,আপনার অনেক মনের খোরাক জুটবে।"

"ঠিক জুটবে কি?" ঊর্মি প্রশ্ন করেছিল।

"কেন নয়?"

"আপনি যাদের কথা বলেন, তাদের নিয়ে ত ভাববার কিছু নেই। মনে হয়, তাদের সবই বাইরে। তাদের ব্যাপার খুঁটিয়ে ভেবে দেখবার কি কিছু থাকবে? আমার ভাল লাগে তাদের নিয়ে ভাবতে বাইরে থেকে যাদের মনের কিনারা পাওয়া যায় না। তাদের চিনবার মধ্যেই ত...."

ঊর্মি থেমে গিয়ে তাকিয়েছিল শম্ভুনাথের দিকে।

"তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু, মিস্ রায়, যারা বাইরে খুব হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে, তাদের ভেতরটা ঠিক তা না হতে পারে।"

"ঠিকই বলেছেন, আপনি। বাইরের আবরণ শুধু আবরণই হতে পারে। যাব আমি আপনাদের মিলন উৎসবে।"

এই পর্যন্ত অবশ্য ওর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এমনভাবে ও নিজের তৈরী রুটিনের মধ্যে আটকে গেছে, ইচ্ছে হলেও পেরে ওঠেনি। আজকে বিশেষ করে কথাগুলো মনে হোল।

তাইত মিঃ মল্লিকের মনে স্ত্রীর জন্য কষ্ট ছাড়া আরও যে আঘাত রয়েছে, তা কোনদিন বোঝেনি। মনে হয়, হেসে খেলে বেশ দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে। একটা কাঁটার খোঁচা ছাড়া আর সবই শান্ত। না, মানুষকে চেনা দুরূহ ব্যাপার। একে চিন্তার মধ্যে আনতে হবে, চিনবার চেষ্টা করতে হবে।

সত্যিই ত মানুষকে 'জাষ্ট লাইক ছ্যাট' উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

একদিন সে সময় করে যাবে তাদের সোসাইটিতে। তার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য। তার পরিধি বাড়াতে হবে। না হলে, যত দিন যাবে, তার চিন্তার খোরাক যাবে ফুরিয়ে। তখন সে কি করবে?

মল্লি মানুষের বাইরের ঝঞ্ঝাট বুঝতে চেষ্টা করে। তাকে চেষ্টা করে মেটাতে। আর সে চেষ্টা করে মানুষের মনটা দেখতে, বুঝতে। সে ভাবে, দুই বন্ধু এদিকে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। আবার ভাবে, ঠিক সেভাবে কি মানুষের মনের চিন্তা ধারাকে ধরে রাখা যায়?

সে তাদের সাইকলজির দিকটা, মানে মানসিক দিকটা বেশী বুঝতে চেষ্টা করে বলে কি বাইরের দুঃখ কষ্ট অসুবিধাটা বোঝে না? সমুদ্রের জলের মধ্যে যেমন সঠিকভাবে লাইন টানা যায় না, মনের সমুদ্রেও পারা যায় না।

উর্মিলার মনে হোল, শম্ভুনাথকে সে নূতন অনুভূতি দিয়ে দেখল। তাই ত আজ ওর সঙ্গে কত কথা বলতে ভাল লাগছে।

বেশীর ভাগ সময়ই ওর মনে হয়েছে, মল্লিক বড় ভাসা ভাসা। তাই হাল্কা ভাবেই ওকে ভেবেছে।

টের পায়নি, মায়াদেবী কখন উঠে চায়ের টেবিলে সব ঠিক করে ফেলেছেন।

"আজকে কি হোল বলুন ত শম্ভুনাথবাবু? দু'জনে কথায় কথায় কোথায় ভেসে গিয়েছিলাম। বেলা যে পড়ে গেল, সেদিকে মোটেই হুঁস নেই।"

শম্ভুনাথ কোন উত্তর দিল না। আজকেই, এত দিনের মধ্যে ওর মনে হোল উর্মিকে অনেকটা কাছে পেল। তাই মনটা তার তৃপ্তিতে ভরা। এতদিন, কেন জানি, তার মনে হয়েছে উর্মি ওকে সিরিয়াস্‌লি নেয় না।

উর্মির চিন্তার মধ্যে যদি সে ঢুকেও থাকে, তা একটা ছোট্ট কোণে। বোধ হয়, তাও নয়। চোখের বাইরে গেলেই ও চলে যায় মনের বাইরে।

আট

সবাই চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধার, বলতে গেলে কলকাতার লোকেদের জীবন। এই লোকারণ্য শহরে মানুষ এখানে এসেই খোলা হাওয়াতে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচবার পথ পায়।

জল, হাওয়া এ দুটি হচ্ছে প্রাণের স্পন্দন। এ দুটিকেই আমরা এখানে পাই একসঙ্গে। নৌকা দেখে উর্মির বড় ইচ্ছে হোল, একটু চড়ে। কিন্তু চার জনের মধ্যে দু'জনকে পাবে রেখে যেতে তার মন চাস না। তার চাইতে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ভুবনেশ্বরে যাবার প্ল্যানটা পাকা করে ফেলল। চার দিন পরে প্লেনে রওনা হবে।

"রবিকে নিয়ে দরকার নেই। ক'দিনের জন্য ওকে ছুটি দিয়েছি। বাড়ী যেতে চেয়েছিল। তাছাড়া আমার মনে হয়, আপনার বন্ধুর বাড়ী দেখাশুনা করবার জন্য মালী আছে। তাকে একটা রাঁধুনী ঠিক করে দিতে বললেই হবে।"

"ঠিক বলেছেন আপনি। মনে পড়ে গেল, বন্ধু বলেছিল, ওদের মালীর স্ত্রী খুব ভাল রাঁধে! ঐ রাঁধে যে যখন যায়। ওদেরও কিছু উপরি হয়, অতিথিদেরও হাঙ্গামা কমে।"

"তবে কোন ল্যাঠাই নেই। তাছাড়া উড়িষ্যার নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বরে ভাল ভাল হোটেল হয়েছে। মাঝে মধ্যে সেখানেও মুখ বদলান যাবে। ভাবতে এত ভাল লাগছে। জানেন, ইচ্ছে হচ্ছে এখনই রওনা হয়ে যাই।"

গুণ গুণ করে গেয়ে উঠল উর্মি, 'কেন পান্থ চঞ্চলতা"।

"উর্মিদেবী, আপনার রেকর্ডগুলো শুনে শুনে আশ মিটত না। শুধু মনে হোত, কবে শুনব আপনার গান আপনার গলায়। মনে পড়ে, কতদিন আগের সেই দিনটার কথা। মল্লিদের বাড়ীতে প্রথম আপনার গান শুনি। মনে হয়েছিল মানুষের জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া বুঝি কিছু নেই।"

"আপনি যে গান এত ভালবাসেন, তখন ঠিক এতটা বুঝিনি। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম। আমারও খুব ভাল লাগে নিজের লোকেদের শোনাতে। এখন ত অফুরন্ত সময়।"

মায়াদেবী ও ব্রজেনবাবু একটুক্ষণ হেঁটে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলেন। আস্তে-আস্তে লোক কমে যেতে দেখে মায়াদেবী উর্মিলাকে ডাকলেন, "চল, এবার ওঠা যাক্। আর বোধ হয় এখানে থাকাটা ঠিক না"।

উর্মিলার নদীর ধার থেকে চলে যেতে মোটেই মন চাইছিল না। তবুও সায় দিল। এমন জায়গাতে এভাবে থাকাটা ঠিক নিরাপদ নয়।

"এবেলা চল সকলে মাদ্রাজী খাবার খাওয়া যাক্।"

সকলে একটা মাদ্রাজী খাবার জায়গাতে গিয়ে নানা ধরনের খাবার নিল। শেষে নিল এক এক কাপ কফি। একবার উঠে গিয়ে শম্ভুনাথ নিয়ে এলো পান।

"দেখ উর্মি, শম্ভুনাথের কেমন মনে আছে। এটা ঠিক, তৃপ্তির সঙ্গে খাবার পরে একটা পান হলে, যাকে বলে একেবারে টপিং।"

বাড়ী ফিরতে ফিরতে শম্ভুনাথ হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা মায়াদেবী, কালকের প্ল্যানটা একটু বদলালে কেমন হয়?"

"কি রকম?"

"কালকে চলুন বটানিক্যাল গার্ডেন। কত কাল যাওয়া হয় না।"

"আমারও তাই ইচ্ছে করছে। মনটা কেমন ছুটি ছুটি হয়ে গেছে। বোধ হয়, একভাবে রুটিন মত এত দিন চলে লাগাম ছাড়া মনটা শুধু ছুটে বেড়াতে চাইছে।"

"বেশ ত, তাই হোক। পাকা চালক সঙ্গে। নির্ভয়ে যাওয়া যায়।"

ব্রজেনবাবু সায় দিলেন।

"কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে খাবার কি করে তৈরী হবে?"

"মা, তুমি যে কি? খাবার কেন সঙ্গে যাবে? ওখানে খাবার ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে শুধু সামান্য টিট্-বিট্স্ আর খাবার জল পথের জন্য। তা আমার ওপর রইল ভার।"

তাই ঠিক হয়ে গেল। ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে যাবার সময় ভুবনেশ্বরে যাবার টিকিটের কথা উর্মিলা মনে করিয়ে দিল শম্ভুনাথকে।

মায়াদেবী সকালে উঠে ত অবাক। অন্ধকার থাকতেই উর্মিলা উঠে রবিকে নিয়ে পরোটা আর আলুর দম বানিয়ে ফেলেছে। আর বানিয়েছে ডিমের স্যানডুইচ।

"কি-রে, দুষ্টু মেয়ে? তুই না বললি, ওখানে খাবার ব্যবস্থা আছে?"

"আছেই ত। এগুলো ত পথের জন্য। আর তোমাকে যদি বলতাম, তবে তুমি রাত থাকতে উঠে পড়তে। সেটা কি ভাল হোত? কালকে সারাদিন ঘোরা হয়েছে। আজও হবে।"

মায়াদেবী হাসলেন, "তুই আমাদের মা ছিলি আগের জন্মে।"

"যাও, এখন দু'জনে আরাম করে বিছানায় বস গিয়ে। আমি চা নিয়ে আসছি।"

শম্ভুনাথ যখন এসে হাজির হোল, তখন সকলে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে তৈরী। গাড়ীতে উঠতে উঠতে মিঃ মল্লিক বল্লেন, "সঙ্গে ত টিফিন কেরিয়ার নেবার কথা ছিল না।"

"বেশ। কিন্তু আপনার গাড়ীতে এই বাক্সগুলো কিসের?"

"এগুলো কুরী থেকে কেনা কিছু।"

বাধা দিয়ে উর্মিলা বলে উঠল, "এগুলোর কথা ছিল নাকি?

ব্রজেনবাবু হেসে বললেন "আমাদের ফাঁকি দিয়ে দু'জনে অনেক কিছু করে ফেলেছ।"

মোটর ছুটে চললো বটানিক্‌স্ এর দিকে। পিছনের সিটে আরামসে বসল উর্মিলা পা তুলে। মা ও সে ত মাত্র পিছনে। জায়গা অঢেল।

বলে উঠল উর্মিলা, "শুনছ মানুষ ভাই, সবার উপরে গানই শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই। তাই যদি মল্লিক সাহেবের গাড়ী চালাতে বাধা সৃষ্টি না হয়, তবে রাস্তাটা ফাঁকা পেলে গাইব।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এখনও শুরু করতে পারেন। আমার হাত খুব পাকা।"

"আমার গান যে তার, তা-র চাইতেও পাকা। পাকা হাতকেও কাঁচা করতে পারে।"

মনটা সকলেরই খুশী খুশী। অনেক দিন পরে ছকে আঁটা জীবন-ধারার হয়েছে ব্যতিক্রম। তাই চার জনের মনেই আনন্দ, উৎসাহ।

"কতদিন পরে মোটরে করে এত দূর যাচ্ছি। বড় ভাল লাগছে। কত কথা মনে হচ্ছে। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলো।"

বাবার কথা শুনে উর্মিলার ভাল লাগল না। সে জানে অতীতের স্মৃতিতে সুখের সঙ্গে দুঃখ বড় বেশী করে জড়ানো।

তাই বাধা দিয়ে সে বলে উঠল, "আজকের আনন্দের দিনে আমরা পেছনে তাকাব কেন ? আমাদের দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে।"

বলে সে গান ধরল :

"আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস রে সবাই,
টান রে সবাই টান।"

মায়াদেবী চোখ বুঁজে চুপ করে শুনছিলেন। তাঁর এমন সুন্দর গুণের মেয়ে যেন দুঃখ না পায়। যদি বিয়ে করে, যেন ইন্দ্রজিতের মত ছেলে পায়। ওকে সুখী দেখে যেন যেতে পারেন। সামনে যে ছেলেটা বসে আছে, সে ত বেশ ভাল মনে হয়। বেশ অনেক দিন ত দেখছেন। তাদের ওপর বেশ মায়া আছে।

ওঁর মন থেকে প্রার্থনা বেরিয়ে এল—'যে ক'দিন বাঁচবেন যেন ওকে নিয়ে থাকতে পারেন।'

বটানিকেল গার্ডেনে গিয়ে প্রথমই ওরা গেল সেই বট্গাছের কাছে যার কথা ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

"সারা জীবনে কতবার এই গাছের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। বাচ্চা বয়সে দেখেছি বিরাট গাছ হিসাবে। আর সব বট গাছের চাইতে পৃথক, সেটাই বেশী করে কাছে টেনেছে। যৌবনে দেখেছি বিস্ময়ের চোখে। আকর্ষণ করেছে এর বিচিত্র সৌন্দর্য। তখন রঙ্গীন চশমা চোখে পরিয়ে দেন বিধাতা। কতদিন এখানে বসে এই আটাশি ফুট উঁচু

মহীরুহটার দিকে তাকিয়ে ভেবেছি,—আহা, এ যদি প্রকাশ করতে পারত এর অভিজ্ঞতার কথা তবে কত, ক-ত কালের অজানা ইতিবৃত্ত আমরা জানতে পারতাম।"

একটু থেমে বললেন, "আর এখন দেখি আর ভাবি, এরও নিশ্চয়ই বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করে। ভাবে কত কাল আর থাকব বসে বন্দী হয়ে এই মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি; কিন্তু যেতে কি পারছি সেখানে?"

ব্রজেনবাবুরই কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেমন উদাস শোনাল।

"জান বাবা, তোমার এই ভাবুক মনটাই মনে আমি পেয়েছি। এটাই আমার সব চাইতে বড় পাওয়া তোমার কাছ থেকে। সেদিক দিয়ে আমি তোমার ছেলেদের ঠকিয়েছি", বলে হাসল উর্মি।

"ঠিকই বলেছিস্। ওরা হয়েছে নিজেদের মনে নিজেরা। সেটা হওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। না হলে, এক একটা জিনিস এক বংশে আটকে থাকত। নানা দিকে, নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারত না।"

"আজকে আমার এখানে এসে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে মল্লিক সাহেব, আমরা ধীরে ধীরে যত ভার নিজেদের উপর জমিয়ে তুলেছি, সবই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বোঝা নিয়ে আমরা এসেছিলাম পৃথিবীতে, তা সহজ ভাবেই নেমে গেছে। আজকের মত হলেও কি আমরা চারজন আমাদের সঞ্চিত ভারকে মনের থেকে সরিয়ে রাখতে পারিনা?"

"নিশ্চয়ই পারি।"

শম্ভুনাথ উর্মির কথা শুনে ভাবছিল, সত্যই ত যে গেছে তাকে ত মনের মধ্যে রাখবই। কেন তা পারছি না? কেন সুখের, শান্তির স্মৃতি না হয়ে, আছে অসহনীয় জ্বালা?

মায়াদেবী ও ব্রজেনবাবুর মনেও এল সেই কথাই অন্যভাবে, অন্যরূপে। যা পায়নি শুধু তার হিসাব মিলাতে গিয়েই ত যোগফল মিলছে না। তাই ত এত দুঃখ। ছেলেরা দাঁড়িয়েছে। ভাল আছে। সুখে আছে। এখানেই যদি যোগের শেষ হয়, তবে কেমন হয়?

এই বিরাট খোলা মেলা বাগানে ঘুরে ঘুরে ওরা ভুলে গেল, একটু আগেই ওরা ছিল এক আবদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে। মানুষের এই রকম মন বলেই ত সে পারে সব কিছু সহজে নিতে। ভুলে যেতে পারে অতীতকে। ভুলে যেতে পারে ক্ষণকাল আগের ছেড়ে আসা স্মৃতি বা পরিস্থিতিকে।

কিছুক্ষণ ঘোরার পর মায়াদেবী ও ব্রজেনবাবুর চোখে ঢুল নেমেছিল। শম্ভুনাথকে নিয়ে পায়ে পায়ে ঊর্মিলা গেল একটু এগিয়ে। মিঃ মল্লিক খরচ করবেন ভুবনেশ্বরে যাবার জন্য। কথাটাতে প্রথম বাধা দিলেও শেষে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কোন বন্ধু কি বন্ধুর কাছ থেকে নেয় না ?

মল্লির কাছ থেকে কিছু নিতে ত ওর কোন বাধা আসে না। রাতে শুয়ে কিন্তু ওর মতটা গেল পালটে।

মল্লির কথা আলাদা। ওত নিজের লোক। ছোট থেকে, বলতে গেলে বড় হয়েছে একসঙ্গে। কিন্তু মল্লিক সাহেবের সঙ্গে কদিনের বা চেনা, ক'দিনের বা জানা।

যদি সে ভেবে থাকে, এইভাবে কোনদিন না কোনদিন ঊর্মি হবে ওর ঘরণী। তাকে ভাল লাগে শম্ভুনাথের, সেটা সে বেশ বোঝে। তার নিজের যে লাগেনা, তা নয়। কিন্তু তার চাইতে বেশী সে কোন দিন এগুবে বলে তার মনে হয় না।

তার বেশ লাগছে এই জীবন। সেই অবস্থায়। না, এটা সে সোজাসুজি আজ ওকে বুঝিয়ে দেবে বন্ধুত্বের বাইরে যদি সে আশা করে থাকে, তবে এখানেই হোক ইতি।

কারো মনে সে দুঃখ দিতে চায় না। কারো মনে সে অযথা আশাও জাগতে চায়না।

"মিঃ মল্লিক, অনেক ভেবে দেখলাম কালরাতে।"

শম্ভুনাথ খুব মন দিয়ে একটা দুষ্প্রাপ্য গাছের চারা দেখছিলেন। চম্‌কে চাইলেন ঊর্মিলার দিকে। এই মেয়েটা সত্যি, সমুদ্রের

ঢেউয়ের মত। এর কূল পাওয়া দায়। আবার জানি কি ভেবেছে, আবার জানি কি বলবে যার জবাব পাওয়া হবে দুষ্কর।

ঊর্মির গলা আবার শোনা গেল, "আচ্ছা, আপনার আমাদের জন্য খরচ না করলেই কি নয়? এই যে সহজ সাহচর্য্য, এই যে বন্ধুত্ব, একে টাকা আনা-পাই-পয়সার মধ্যে এনে মলিন করার কি দরকার? আমি বলি, টাকা আমিই দি। আমার বাহুল্য না থাকলেও ঝেড়ে ঝুড়ে সামলাতে পারব। তার পরও যদি প্রয়োজন হয়, মল্লি আছে, আপনি আছেন। হাত বাড়িয়ে ধার নেব। আপনি যে আমাদের এত সাহায্য করছেন, সব ব্যবস্থা করছেন, তার মূল্য নেই? বিশেষ করে বাবার শরীর ভাল না। পারতাম কি আপনাকে ছাড়া ওদের নিয়ে বাইরে বের হতে?"

কথা শুনে শম্ভুনাথ মনে পেল ব্যথা। ঊর্মিলাও ওকে চিনল না। ও বাহ্যিক আবরণ পছন্দ করে। টাকার ওপর ওর মায়া আছে। তা বলে সে কি এত নীচ যে, সামান্য কটা টাকা খরচ করছে ওর কাছ থেকে কোন কিছু আদায়ের তালে?

ও চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। ঊর্মি-বুঝল, ও মনে পেয়েছে ব্যথা। কিন্তু ও যে নিরুপায়। ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে ও এগুতে চায় না। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না।

"কি? চুপ করে রইলেন কেন, মল্লিকসাহেব? কিছু অন্যায় বলেছি আমি?"

"ন্যায় বা অন্যায় যে অনেক বড় কথা হয়ে গেল, ডঃ রায়। অত আমি বুঝি না। আমি বুঝি আপনাদের সাহচর্য আমার জীবনে দেয় সুখ, আনন্দ। সে যে মূল্যহীন, তা কি বোঝেন আপনি? আপনি অনেক কিছু বোঝেন; কিন্তু এ যে কত বড় জিনিস, পৃথিবীতে সত্যিকারের দুর্লভ, তা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। তাই তার মাঝখানে এনেছেন টাকা-আনা পাইকে। বোকা হলেও এতটুকু বুদ্ধি ত আছে আমার। আপনি ভেবেছেন, এর জোরে আমি আর কিছু আশা করব আপনার কাছে।"

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "আমাকে যা দেন, যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে আপনার সঙ্গে, তার চাইতে এক কণাও কোনদিন আমি প্রত্যাশা করব না। কিন্তু এই পাওয়াকে আপনি নষ্ট হতে দেবেন না। বেশ, টাকা আপনি দিয়ে দেবেন। কিন্তু প্লিজ্। যাওয়া স্থগিত করবেন না। চার জনে যাব একসঙ্গে ; ভবিষ্যতে কোন কিছু পাবে সেই আশা ছাড়া আমাকেও যে কেউ চায় সেটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

ওর কথা শুনে উর্মি যেন কিছুটা বুঝল মল্লিককে।

"ঠিক আছে শম্ভুনাথবাবু, আপনিই খরচ করবেন। আপনি থাকতে আমিই বা কেন ধার করে মরি। একদিকে মল্লি, অন্যদিকে আপনি এই দুই অবস্থাপন্ন বন্ধুর মাঝখানে আমার ধার করার কোন মানে হয় ? ঠিক আছে। এখন থেকে প্রয়োজন হলেই বলব—ফেলুন কড়ি···", বলে উর্মিলা হেসে তাকাল ওর দিকে।

শম্ভুনাথ হেসে সহজ ভাবে উত্তর দিল, "বাঁচালেন। যা গোলমেলে এক বন্ধুর পাল্লায় না পড়েছি। আপনার নামের মতই আপনার গতির ঠিক নেই। ঢেউএর মত। কোথা দিয়ে, কোন দিক দিয়ে যে চলে যায় আপনার ভাবনা ? দয়া করে কিছু দিনের জন্য সোজা ভাবে চলতে চেষ্টা করুন ত।"

"বেশ, তাই চলব ক'দিন। তবে এটা জানবেন, সব সময়ের জন্য সে কথা দিতে পারব না। নামটার মান রাখতে হবে ত ?"

"বেশ। তাও ত কটা দিনের জন্য রেহাই পাব।"

উর্মিলার খুব ভাল লাগছিল ওর সঙ্গে কথা বলে। দাদার ব্যাপারটাতে বাইরে যতই ও সহজ ভাব দেখায়, মনে কি ব্যথা পায়নি ? ওর কথা মনে এলেই চোখে জল আসে। তাই ত ও এত বোঝে মা-বাবার দুঃখ।

তারপর আস্তে আস্তে অনুপও বোধ হয়, ছাড়া ছাড়া হয়ে যাবে। তখনই মনে হোল, নদীর এক কূল ভাঙ্গে ত অন্য কূল গড়ে। মানুষের জীবন ও বুঝি তাই।

মল্লি, শম্ভুনাথ এরা এসে দাঁড়াচ্ছে কত কাছে। ভগবানের এইসব ছোট ছোট আশীর্বাদই ত মানুষকে চালিয়ে নেয়।

ওরা তাকিয়ে দেখল মায়াদেবী ও ব্রজেনবাবু বড হাসিখুশি ভাবে কথা বলছেন হেঁটে হেঁটে। বোধ হয়, তাদের ফেলে আসা উজ্বল দিনের কথা ভেবে, বলে আনন্দ পাচ্ছেন।

সেই বয়সে শুধু আশা,—হবে, ঠিক সব হবে। রাস্তার ধুলো, কাদা তখনও গায়ে লাগেনি। আসে'ন হতাশা।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে হাজির হোল উর্মিদের কাছে। ওদের দু'জনের হাসিখুশি চেহারা দেখে বলে উঠলেন দু'জনে, "দু'জনের খুব গল্প হচ্ছে আমাদের বাদ দিয়ে।"

"বারে। তোমরা দু'জনে কত গল্প করলে আমাদের বাদ দিয়ে", উর্মিলা হেসে উঠল।

"ঠিক বলেছেন, উর্মিলাদেবী। আমাদের আপনারা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করলেন। তবে এখন আর তা চলবে না। একটা গাড়ীতে চড়েই চারজনকে ফেরার পথ ধরতে হবে।"

"ঠিক বলেছ, শম্ভুনাথ। এখন আদান প্রদান না করলে পেঁচার মত মুখ করে বসতে হবে," ব্রজেনবাবু বললেন।

"আমি কিন্তু গাড়িতে উঠে পেঁচার মত মুখ করে, চোখ বুঁজে থাকব। কত আমার গোছগাছ করা বাকি আছে। পরশু দিন ত যেতে হবে ভুবনেশ্বরে। তখন ত আবার বক্‌বক্ করে তোমাদের সবাইকে ঠিক মত চালাতে হবে।"

তার পরের দু'দিন উর্মিলারা গোছগাছে রইল ব্যস্ত। শুধু ত সঙ্গের জিনিস গোছান নয়। বাড়ীর দামী বা মূল্যবান জিনিস পত্তর দু'টি ট্রাঙ্কে বোঝাই করে রেখে এলো গিয়ে মল্লির বাড়ীতে। শিবুর মা আর রাজকুমার আছে। কোন ভয় নেই। যুধিষ্ঠির গেছে ওদের সঙ্গে জব্বলপুর।

মল্লির গাড়ীর চাবি দিয়ে এল, আর রোজ ড্রাইভার এসে যেন একবার স্টার্ট্ করিয়ে নেয়। যাবার দিন ভোর না হতেই ওরা বেরিয়ে পড়ল দমদমের উদ্দেশে।

শম্ভুনাথের গাড়ীর ভার নিয়েছে তার এক সহকর্মী। তাই ও ট্যাক্সি করে এসে হাজির হোল ঊর্মিদের উদ্দেশে। রাতেই খাওয়ার পরে ওরা রবিকে ছুটি দিয়েছিল। কথা আছে সকলে গিয়ে সকালের ব্রেকফাষ্ট খাবে এয়ারপোর্টে।

দমদমের পথে যেতে যেতে, বারে বারে ঊর্মির মনে হচ্ছিল, ওর যখন ছোট বেলায় অসুখ করেছিল। একটু বেশী রকমই হয়েছিল। ভাল হবার পরে ডাক্তাররা বলেছিল চেঞ্জে নিয়ে যেতে এক মাসের জন্য। না হলে সম্পূর্ণ সারতে অনেক দিন লাগবে। তখন মা-বাবার হাতে পয়সা ছিল না। বাবার বন্ধুদের কাছে ধার করতে বাধছিল। মা খুলে দিয়েছিলেন তাঁর গহনা। সেই বিক্রি করে সবাই গিয়েছিল হাওয়া বদলাতে। মার অসুখের পরে হাওয়া বদলান দরকার, তা সে মনে মনে বুঝতে পারছিল।

ভেবেছিল, অনুপ চেঞ্জে নিয়ে যাবার কথা লিখবে। কিন্তু তার পরিবর্তে ওরা আসতে পারবে না জানাল। ভাইয়েদের জন্য কত কত করেছেন ওরা। একা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বাবা তেমন সুস্থ নয়।

আজ মনে হোল শম্ভুনাথ সত্যিকারের বন্ধু। তাই ত সে তার কর্তব্য এত সুন্দর ভাবে করতে পারছে। সকালের চা-টা খেয়ে চারজনে চেপে বসল প্লেনে। মা আর বাবাকে ওরা দিয়েছিল জানালার কাছের বাসবার সিট। অনেক সময় প্লেন্ ছাড়তে দেরী হয়। আজকে কপাল গুণে ছাড়ল কাঁটায় কাঁটায়।

মনে হচ্ছে আমাদের এবারের খাওয়াটা সব দিকে শুভ হবে। শুভ সুচনা দিয়ে ত আরম্ভ হোল যাত্রা। কি বলেন, শম্ভুনাথবাবু?"

"আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক"।

নয়

উর্মি দেখল মা-বাবা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের দিকে তাকিয়ে উর্মি বুঝতে পারছিল ওরাও খুশী খুশী। অসুস্থতার কথা ওদের মন থেকে চলে গেছে।

ব্রজেনবাবুর যে হার্ট দুর্বল, তা যেন তার মনে নেই। এখন দু'জনে ওখানে গিয়ে সুস্থ থাকে, শরীরের গ্লানি মুছে যায়, তবেই ত তার নিয়ে যাওয়াটা হবে সার্থক। ধীরে সুস্থে ওদের নিয়ে চলবে। হুড়োহুড়ি করে সব কিছু দেখবার কোন প্রয়োজন নেই। ভাল থাকলে আবার আসতে পারবে।

পরের বার পুরনো জায়গাতে আসতে কারও সাহায্য লাগবে না।

প্লেন থেকে নেমে উর্মিলা বুঝল, শম্ভুনাথ সত্যিই মনের টানের থেকেই ওদের নিয়ে এসেছে। যে বন্ধুর বাড়ী, তার এক বন্ধু মোটর নিয়ে এসেছে এবার পোর্টে। বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, এই গাড়ী ও ড্রাইভার আপনাদের দরকারের জন্য থাকবে।

মিঃ মল্লিকই কথা বলছিলেন, "গাড়ীটা বিকেল তিনটা নাগাদ পাঠিয়ে দেবেন। অনেক ধন্যবাদ।"

"আপনি যে এত ব্যবস্থা করেছেন তাত কিছু বলেন নি?"

"ইচ্ছে ছিল, আপনাকে একটা একটা করে সারপ্রাইজ দেব।"

"আরও আছে নাকি?"

"হতে পারে।"

"ঐ দেখুন, চা নিয়ে এসেছে। আসুন মায়াদেবী, সকলে চা খেয়ে সতেজ হওয়া যাক্।"

ওরা দেখল, চায়ের সঙ্গে ওখানকার মিষ্টি নিয়ে এসেছে। উর্মি দেখল, মালীর বৌটা বেশ চটপটে আর চালাক। বাংলা বেশ ভাল বলে। বাঙ্গালীরাই বেশী আসে থাকতে।

কথার মাঝখানে মালী এসে দাঁড়াল। বাজার যাবে। চাল, ডাল, তেল, ইত্যাদি, সবই আনা হয়ে গেছে।

"পয়সা পেলে কোথায়?" উর্মি জিজ্ঞাসা করল।

"যে সাহেব নামিয়ে দিয়ে গেলেন, উনি দিয়েছেন।"

মায়াদেবী খুব খুশী,—"কি সুন্দর জায়গাতে যে তোমরা নিয়ে এসেছ। আমার ত এখনি খিদে পেয়ে গেছে, আর শরীর ভাল লাগছে।"

"মায়া, তোমার মত সকলেরই অবস্থা। রান্নার ব্যবস্থা কর।"

শিগ্‌গির পয়সা দিয়ে দিলেন মালীর হাতে। মালীর বৌকে ডেকে মুসুরীর ডাল চড়াতে বললেন।

সবাই বসবার পর থেকে উঠে পড়ল। মায়াদেবী গেলেন রান্নাঘরে। সবাই ঘুরে ঘুরে বাড়ীটা দেখলেন। ছোট, ছিমছাম বাড়ীটা। দুটা শোবার ঘর ও দুটা বাথরুম তার সঙ্গে। খাবার ঘর, বসবার ঘর। সবচাইতে ভাল লাগল বারান্দাটা। সেখানে কয়েকটা বেতের চেয়ার রাখা আছে। সামনে ফুলের বাগান। বোঝা গেল, মালীটা লোক ভাল ও পরিশ্রমী।

"বাগান দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল," ব্রজেনবাবু বললেন।

"কলকাতার লোক। ইঁট-পাটকেল ত কিছু চোখে পড়ে না।"

সবাই গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে।

মালী গিয়েছিল সাইকেল করে। দেরী লাগল না। ও এসে পড়ল। একটা ঘরে তিনজনের বিছানা করা হয়ে গেল। অন্যটাতে মিঃ মল্লিকের একার বিছানা।

"আপনি এখন জামা-কাপড় ছেড়ে একটু গড়িয়ে নিন্। তারপর ভাত খেয়ে বিশ্রাম করেই ত তিনটা নাগাদ্ একটু ঘুরে আসতে হবে।"

"ঠিকই বলেছ, শম্ভুনাথ।"

ব্রজেনবাবু গেলেন শোবার ঘরে। মায়াদেবী ততক্ষণে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

"ভাগ্যিস্ রবিকে আনা হয়নি। মালীর বৌ যে শুধু সব জানে,

তা নয়। হাতে পায়ে কাজ লাগে না। বুঝলাম, মুখে বলে দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে হবে না। মালীও গিয়ে হাত লাগিয়েছে। আমিও কাপড় বদলে একটু বিশ্রাম করি। তুইও কাপড় বদলে শম্ভুনাথের সঙ্গে গল্প কর গিয়ে। সত্যিই ছেলেটা কত করছে।"

উর্মিলা কিছু না বলে বাক্স থেকে কাপড় নিয়ে চানের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাঁতের একটা ডুরে শাড়ী পরে ও এলো বেরিয়ে। সবুজ শাড়ীর সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ। সবুজ পাথরের ফুল কানে ও সবুজ পাথরের লম্বা একটা মালা গলায়।

উর্মির কোঁকড়া বব্ করা চুল। এমন সুন্দর ঢেউ খেলান যে তাকে কোন কিছু করবার দরকার হয় না। ঠোঁটে একটু লিপ্‌ষ্টিক ছুঁইয়ে নিল। পাউডারের পাফ্‌টা দিল বুলিয়ে মুখের উপর।

"দেখত মা, কেমন লাগছে?"

হেসে মায়াদেবী বললেন, "আমি আর কি বলব। তোর মেসো তোর নাম দিয়েছে উর্বশী॥

"মেসোর কথা ছাড়। কোথাও কিছু লেগে নেই ত?"

"লাগালি বা কি, যে লেগে থাকবে?

"আমি বাগানে চললাম। ফুল দেখে বড় ভাল লাগছে। তোমরা আস্তে সুস্থে চান সেরে নাও।"

"ফুলের বনে যার পাশে যাই। তারেই লাগে ভাল," গান করতে করতে বারান্দায় গিয়ে থমকে গেল।

একটা পাঞ্জাবী ও পায়জামা পরে পিছন ফিরে মিঃ মল্লিক দাঁড়িয়ে আছেন। মনের আনন্দে গলাটা বেশ ছেড়েই ও গাইছিল। ভাবেনি, এর মধ্যেই মিঃ মল্লিক বেরিয়ে আসবে।

পিছন ফিরে শম্ভুনাথ বলল, "একি! থেমে গেলেন যে? আপনার সঙ্গে একটা অলিখিত শর্ত আছে—আপনি এখানে গাইবেন আর আমি শুনব।"

"শর্ত?"

"প্রায় তাই! বলেন নি—আপনজনকে শোনাতে আপনার ভাল লাগে?" মিঃ মল্লিক ফিরে দাঁড়াল।

"বাঃ, স্বাভাবিকভাবে আপনাকে আরও ভাল লাগছে দেখতে।"

"আমিও সে কথা বলতে পারি—সাহেবী পোষাকেও ভাল লাগে; কিন্তু মনে হয়, এই ঘরোয়াভাবে....," থামল ঊর্মিলা।

"এই যা, বড় ভুল হয়ে গেল। খেয়াল ছিল না আপনি ত মেয়ে নন। কমপ্লিমেণ্ট শুধু ছেলেরা দেখে মেয়েদের—এটাই নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে গেল।"

হেসে শম্ভুনাথ বলল, "আপনি কি মনে করেন, আপনি আর সকলের মত? নিজেই ত আপনি নিয়মের ব্যতিক্রম। আপনি আর আপনার বন্ধু মল্লিকাদেবী। আমি সারা জীবনে কত মেয়ে দেখলাম দেশে, বিদেশে। আপনাদের জুড়ি পাওয়া মুস্কিল।"

"যাই বলুন মল্লিক সাহেব, পুরুষের এই চালাকাকিটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। মেয়েরাও তেমনি এই জালের মধ্যে বেশ ধরা পড়ে নির্জীব হয়ে ভাবছে, তারা কত সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে। এটা বুঝবার ক্ষমতা নেই, এই সব ছিটেফোঁটা দিয়ে বড বড় ব্যাপারে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

পরে বলল, "এই-যা। এসব ভাবনার মধ্যে গেলে সময়টা যাবে মাটি। এমন সুন্দর দিন, এমন সুন্দর পরিবেশ। মন চাইছে গাইতে।"

"ঠিক বলেছেন, মিস রায়,"—একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল শম্ভুনাথ। ঊর্মিও এসে বসল।

আজকে ওর মনটা ফুলের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল। সংসারের উড়ে এসে পড়া কালিমার টুকরো গেল মিলিয়ে। ফুলের মত সুন্দর, স্নিগ্ধ, পবিত্র হয়ে উঠল।

ছোটবেলায় মনটা যেন কে এসে বসিয়ে দিয়ে গেল। পেস-মেকারের মত। মনে হোল, মানুষ যদি পারত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ মনের জায়গাতে সতেজ আনকোরা মন, যাতে কোন কিছুর ছাপ নেই, তা বসিয়ে দিতে। বোধ হয়, পারবে কোন আগত দিনে।

এখন নিজেকেই সেই চেষ্টা করতে হবে, আর কারও সাহায্য ছাড়া, তা সে যত কঠিনই হোক না কেন।

উর্মি ঠিক করল, আজকে তা সে করবে, তার পুরাণো মনকে নূতন করতে। দুঃখের ভাবনাকে মুছে নূতনের স্বাদ পেতে। সেখানে থাকবে হীরে-পান্না। কাঁচের টুকরো নয়। শুধু হাসি। কান্না নয়।

এই পৃথিবীতে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে আছে মৃত্যু। আজকের মত সে মৃত্যুকে তার কালো পর্দা শুদ্ধ দেবে দু'হাতে সরিয়ে। এখন শুধু দিনের কথা ভাববে। যদিও সে ভাল করেই জানে, রাত অপেক্ষা করছে দরজার ওপারে। তবুও সে অল্প সময়ের জন্য হলেও রাতকে ঢুকতে দেবে না।

তাই তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, মন মোর মেঘের সঙ্গী।"

চোখের উপর হাত রেখে শম্ভুনাথ বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। কখন যে গান থেমে গেছে, তা যেন সে বুঝতে পারেনি। সারা মনে, শরীরে শুধু একই রেশ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী।"

উর্মিলা যেন বুঝতে পারল শম্ভুনাথকে। তাই বুঝি তার স্বপ্নকে ভাঙ্গল না। কেউ যদি ভাবনার মধ্যে দিয়ে মেঘের সঙ্গী হয়ে ধুলায় ধূসরিত পৃথিবীর কাছ থেকে ক্ষণিকের জন্যও সরে যেতে পারে, তাতে ক্ষতি কি?

আস্তে আস্তে মিঃ মল্লিক চোখ খুলে তাকাল উর্মির দিকে "আপনার গান আমাকে নিয়ে যায় এমন এক পরিবেশের মধ্যে যেখান থেকে ফিরে আসতে বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, এই ভাবের মধ্যে যদি কাটিয়ে দিতে পারতাম তবে কেমন হোত?"

উর্মিলা বলল, "ভালই বোধ হয় হোত। কিন্তু তা হবার নয়, মল্লিক সাহেব। তা হবার নয়। সেই বটানিক্সের বট গাছটার মত। আকাশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে বাধা নেই, কিন্তু পা দুটা থাকবে সেঁটে মাটির সঙ্গে। আপনি জানেন না।"

মালীর বৌ জানকী এসে বলে গেল, খাবার তৈরী হয়ে গেছে। তাছাড়া হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল—বারটা বাজে।

"তাইত," শম্ভুনাথ উর্মির সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল।

"ভাল জিনিস অভাগারি কপালে বেশীক্ষণ সয় না।"

"আমার ত মনে হচ্ছে, আমরা সকলেই ভাগ্য নিয়ে এসেছি। তাই ত বেশ কিছুদিনের জন্য এখানে একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছি।"

"সেকথা খুব ঠিক বলেছেন, মিস্ রায়। যা চেয়েছিলাম, তা ভুল করে চাইনি। তাই ত পেয়ে গেলাম হাতে হাতে।

খেয়ে উঠে সকলেই একটু বিশ্রাম করতে গেল। ওরা আগেই ঠিক করেছিল—প্রথম দিন যাবে উদয়গিরি, খণ্ডগিরির গুহা দেখতে। এক সময় এইসব গুহাতে বাস করতেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। প্রায় ষাটটা গুহা।

ওরা অবশ্য গেল কয়েকটা দেখতে। ভারতবর্ষের গুহার মধ্যে এরাই সব চাইতে সুন্দর। এমন সুন্দর কারুকার্য খচিত গুহা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

"এদের নামগুলো দেখেছিস্। উর্মি! স্বর্গ, হস্তী, জয়, ব্যাঘ্র, রানীকুঞ্জ ইত্যাদি।

"আমার মনে হয়, কি জান বাবা, এই সব নামের নিশ্চয় একটা অন্তঃর্নিহিত মানে আছে।"

"আছে ত নিশ্চয়ই। দেখছিস না, রাণী গুহার কারুকার্য অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর," মায়াদেবী বললেন।

এখানে এসে সকলেরই মুখ খুলে গেছে।

মল্লিক সাহেব বলে উঠলেন, "আপনি যা বললেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে কোন এক রাণী প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য এসে-ছিলেন। তাই ত এটা, প্রায় বলতে গেলে ছোটখাট দোতালা প্রাসাদ। তার উপর লক্ষ্য করেছেন, গুহার মুখে পাথর দিয়ে তৈরী দুই শান্ত্রী দাঁড় করান। প্রায়শ্চিত্ত করতে এলে কি হবে? রাণী ত বটে, তাই রাজসূয় ব্যবস্থা।"

"দেখে কি মনে হচ্ছে, জানেন," উর্মিলা বলে উঠল, "তখনকার

রাজা রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাশীর রাজার মত ছিলেন না। তার রাণী, করুণাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে যেতে হয়েছিল ছিন্ন বস্ত্রে।

এইভাবে নানা কথা বলতে বলতে চার জনে নেমে এলো। আরও গুহা ছিল। মা-বাবাকে হয়রাণ করতে উর্মিলার আর ভাল লাগল না। ওখান থেকে ওরা গেল চার মাইল দূরে, খৃষ্টের জন্মের দু'শ ষাট বৎসর আগের তৈরী রাজা অশোকের অনুশাসনলিপি খোদাই করা প্রস্তর খণ্ড দেখতে। এইটা দেখবার জন্য ওদের খুব ইচ্ছা ছিল। এতে লেখা আছে, কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ কাহিনী। এর পরেই ত ভারতবর্ষের এক বিরাট পরিবর্তন হোল। সম্রাট অশোক হলেন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত।

সেই হোল মহাত্মা গান্ধীর নন্‌ভায়োলেন্সের গোড়াপত্তন।

ওখান থেকে ওরা ফিরে বাড়ীতে এলো। হাঁটাও হয়েছে বেশ, দেখাও হয়েছে অনেক, ঘোরাও হয়েছে। তাই সকলে ফিরে যাওয়াই স্থির করল। রাস্তায় এক জায়গাতে গাড়ী থামিয়ে চা-এর পর্ব শেষ করে নিয়েছিল।

জানকীর গুছিয়ে দেওয়া খাবার সকলে মিলে সদ্‌ব্যবহার করল। যখন এসে ওরা ঘরে ঢুকল, ঘড়িতে সাতটা। ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবীর বেশ হয়রান লাগছিল। মালী ও মালী-বৌ যেন তৈরীই ছিল। গরম গরম এক এক কাপ চা দিল সবার হাতে ধরিয়ে।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ব্রজেনবাবু বলে উঠলেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, জানকী।"

কত সামান্য জিনিসে মানুষের মন ভরে দেওয়া যায় উর্মি ভাবল। মানুষ কি কৃপণ; তাও তারা করতে নারাজ।

বাড়ী এসেই ওরা গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল।

"আপনার যদি খুব হয়রান না লাগে, তবে চলুন না, পায়ে পায়ে একটু হেঁটে আসা যাক্। উর্মিলাদেবী।"

"বেশ ত। মা-বাবা এখন রাতের খাবারের আগে বিশ্রাম করুন। আমরা একটু ঘুরে আসি। আমরা যতই আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়বার চিন্তা করি না কেন, মাটির মানুষ মাটির ছোঁয়া না পেলে

প্রাণটা যেন কেমন করে। মোটরে চড়ে ত অনেক দেখা হোল, এখন মাটির সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচয় করি।"

"এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, উর্মিলাদেবী", মুচকী হেসে শম্ভুনাথ বলল।

"কি রকম?"

"এতক্ষণ বুঝি আমরা পায়ের সাহায্য ছাড়া গুহাগুলোর স্পর্শ পেয়েছি?"

"কেমন জব্দ। শম্ভুনাথ কথার মার-প্যাচ ধরে ফেলেছে"। ব্রজেনবাবু হা হা করে হেসে ফেললেন।

"সত্যিই, আপনিও কথায় কম যান না একথা, এতটা আমার জানা ছিল না।"

কি করেই বা থাকবে, বলুন। কথা ত আপনার কাছে শেখা। এক-আধ সময় গুরুমারা বিদ্যে হয়ে যায় আর কি। সব সময় ত মাথা নত করে থাকি।"

"থাক, হয়েছে সব কথা কাটাকাটি। এখন যাও ত দু'জনে একটু হেঁটে এসো গিয়ে! রাত হতে চলল। বেশী দূরে যাসনি কিন্তু উর্মি," মায়াদেবী বলে উঠলেন।

সেদিন মনে হোল, জ্যোৎস্নার আলো তেমন নয়। আধো-আঁধারির মধ্যে হাঁটতে দু'জনের বেশ লাগছিল। রাস্তার আলো অবশ্য ছিল। উর্মিলা গম্ভীর ভাবে আপন মনে হাঁটছিল। শম্ভুনাথ মাঝে মধ্যে তাকিয়ে দেখছিল ওর দিকে। না, একদম ভাবলেশহীন মুখ। মনে হয় না, কোন ভাবনা আছে মনে। সবকিছু থেকে যেন মুক্ত।

সে যে সঙ্গে আছে, তাও বুঝি মনের কোণ থেকে মিলিয়ে গেছে।

সে ত পারছে না ঠিক এইরকম মনকে নির্লিপ্ত রাখতে। কেন জানি, মনে হচ্ছে ওর আঙুলের সঙ্গে আঙুলের ছোঁয়া লাগলে বেশ হয়। একটু ছোঁয়াতে রক্তের প্রতিটা কণায় বেজে উঠবে ঝংকার। নূতন শিহরণ জাগবে শরীরে।

অনেক বছর আগে স্ত্রীকে নিয়ে এক নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে

হাঁটতে এই অনুভূতিটা এসেছিল। মনে হয়েছিল সারা শরীরে যেন আগুনের ছোঁয়া এসে লেগেছে!

তারপর কত মেয়েকে নিয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু কখনও তার এমন হয়নি।

আবার আড়চোখে একবার চাইল ঊর্মির দিকে। না, ভাবহীন শান্ত মুখ। আরও স্বাভাবিক হতে হবে। না হলে এই যে সুন্দর বন্ধুত্ব, চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ মিঃ মল্লিক কথা বলে উঠল, "কোথায় আছেন, ঊর্মিদেবী?"

চমকে ফিরে চেয়ে ঊর্মি বলল, "কেন, ভুবনেশ্বরের একটি অতি মনোরম বাস্তাতে। ততোধিক মনোরম পরিবেশে।"

হেসে মিঃ মল্লিক জবাব দিল, "আমি আশা কবি, এই পরিবেশের একপাশে আছি।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সে আব বলতে। আকাশের চাঁদ, রাস্তার ধুলো, তার মাঝে গাছ-পালা গাড়ী-ঘোড়ার ভিতরে আমরাও দু'জনে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছি নিশ্চয়ই। যাক্, কিছু যেন বলবেন বলবেন মনে হচ্ছে?"

"না, থাক্। আচ্ছা, মিস্ রায়, কি ভাবছিলেন এত?"

"কিছু ত ভাবছিলাম না"।

"কোন কিছু না ভেবে থাকা যায়?"

"যায় বোধ হয়। আমাব অনেক সময় মনটা একবারে ফাঁকা হয়ে যায়। একটু আগে যা ছিল। তাতে মনে হয়, মন নামক বস্তুটা একটু বিশ্রাম পায়। তারও বিশ্রামের দরকার।"

"আশ্চর্য! তাকি পারা যায়?"

"যায় না বোধ-হয় বেশীর ভাগ। সকলেই সে কথা বলে থাকে। আমি পারি ছোট বেলা থেকেই। বেশী ভাবি বলেই, বোধ হয় তা সম্ভব হয়। থাক সে কথা। চলুন ফেরা যাক্। কাল তিনটার সময় কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে, রাতে খাবার পর আলোচনা করা যাবে।"

সারা রাস্তা উর্মিলা কোন কথা বলেনি। মল্লিক সাহেবও না। বোধ হয়, মনকে ভাবনাহীন করার প্রচেষ্টা করছিলেন শম্ভুনাথ। খাবার পরে আর বিশেষ কথা হোল না। সবাই ক্লান্ত।

"সকালে উঠেই কালকের শুভ-যাত্রার কথা ভাবা যাবে।" উর্মিলা বলে উঠল।

খুব ভোরে উর্মির ঘুম ভেঙ্গে গেল। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। মুখটা ধুয়ে, পা টিপে টিপে ও এসে দাঁড়াল বারান্দাতে। রাতের শেষে দিনের আলোর আবির্ভাব এত ধীরে, ঠিক মনে হয় নব বধূর সলজ্জ গতি।

দশ

চেয়ারে না বসে উর্মি গিয়ে বসল বারান্দার সিঁড়িতে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে। মনের চোখে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য।

ও তখন বেশ ছোট, কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটি ঘটনা তার মনে রয়ে গেছে। তার ছোট পিসীমার বিয়ে। বাচ্চা মেয়ে। কতটুকু আর বয়স হবে? তের-চোদ্দ। মাথায় ময়ূরের মত ফুলের মুকুট, সিঁদুর টিপের চারিদিকে চন্দনের টিপ সুন্দর করে দেওয়া। সারা মুখেও। নানা ধরনের গয়না পরা। কি সুন্দর লাগছিল দেখতে। সলজ্জ চাহনী। কত আশা ফুটে উঠেছে তার চোখে। স্বামীকে ঘিরে তার ভবিষ্যৎ।

সবাইকে ছেড়ে যেতে সে কেঁদেছিল ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও নূতনের জন্য আকুলতা বা ব্যাকুলতা ছিল। সেই আশা কি পূর্ণ হয়েছিল সেই কচি মেয়েটার?

না, হয়নি।

সব আশা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পিশেমশাই সুবিধার লোক মোটেই ছিলেন না। বেশ মনে পড়ে, দাদু ঠাকুমার চোখে নিরুপায়ের চোখের জল। বাবার আস্ফালন, মার হতাশা। সব মিলিয়ে তাদের সংসারের শান্তিও গিয়েছিল নষ্ট হয়ে।

সে ঠিক এত দুঃখের কারণটা ধরতে পারে না। পিসী দূরে থাকলে

যদি এত কষ্ট, তবে কেনই বা তাকে দূরে পাঠান? আর আনিয়ে নিলেই ত মিটে যায়।

একদিন সে ঠাকুমাকেও সে কথা বলেছিল।

ঠাকুমা তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন. "তা যে আর হয় না, যাদুসোনা।

সে তখন কিছু বুঝতে পারেনি. কেন হয় না। সে মনে মনে ঠিক করল, বড হলে নিজে গিয়ে সে তার সোনাপিসীকে নিয়ে আসবে।

সে সুযোগ আর জীবনে আসেনি। বড হবার আগেই দুঃখের জীবন থেকে পিসী পেয়েছিল রেহাই। আর রেহাই পেয়েছিল পিসীর বাবা-মা, দাদা-বৌদি।

পিসীর সেই ছোট্ট মুখটি অনেকদিন পরে তার চোখেব সামনে ভেসে উঠল। মনে হোল, কবিতাতেই এসব অনুভূতি ভাল লাগে; সত্যিকারেব জীবনে তার স্থান নেই।

আজকালকার মেয়েরা বা তাদের অভিভাবকরা তা বুঝতে পারছে। তাই ত জীবনের ধারা পালটেছে ও পালটাচ্ছে।

ঊর্মিলা চোখের ওপর হাতটা রেখে কোন এক চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। হঠাৎ কাঁধের ওপর হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, মা পাশে বসে তার কাঁধের উপর হাতটা রেখেছেন,—"কিরে বাবি? কি এত ভাবছিস তখন থেকে?" আদর করে, মা অনেক সময় বাবি বলে ডাকেন তাকে।

"হঠাৎ কেন জানি, সোনাপিসীর কথা মনে এলো।"

মা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। "জানিস, কি আশ্চর্যের কথা। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই তোর বাবারও সোনার কথা মনে পড়েছে। চোখ মুছছিলেন বসে বসে। তোরও মনে হয়েছে। আজকের দিনটিতে তার দুঃখের দিন ফুরিয়েছিল। আমি বলেছি,—আজকে দুপুরে বেরিয়ে ওর নামে একটা পুজো দেব। মনে হয়, সে নিজে যেন তোদের মনের মধ্যে এসে বলতে চেয়েছে—"তোমরা আমাকে ভুলে যেও না।"

দু'জনে আস্তে আস্তে এসে চায়ের টেবিলে বসল। বাবা আর শম্ভুনাথ এসে বসেছে। খাওয়ার শেষে সবাই এসে বসল বারান্দাতে। বারে বারেই ঊর্মিলার মনে একটা কথাই ঘুরেফিরে আসছিল। সৃষ্টিকর্তা তাঁর কোন কিছুই হারিয়ে যাওয়া চান না। বড় যত্নের সঙ্গে, কষ্টের সঙ্গে ভালবেসে তিনি করেন প্রতিটা জিনিস সৃষ্টি। তাই বুঝি চোখের সামনে থেকে চলে গেলেও তা সত্যি সত্যি যায় না। মনের মধ্যে তা ফিরে ফিরে আসে। মনের মধ্যে তারা বেঁচে থাকে।

সোনাপিসী কবে চলে গেছে। কিন্তু সে কি সত্যি গেছে? তা ত সে যায় নি। তাই ত সে, যারা আছে তাদের ভেতর দিয়ে আবার বেঁচে ওঠে। নদী, ফুল, লতা, পাতা তারাও কেউ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় না। কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন দিন তারা আসে, আসবে।

শম্ভুনাথ বুঝতে পারছিল, কি একটা যেন এদের মনকে ব্যথিত করছে। হাসিখুশি মানুষগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, মনের কোণে লুকিয়ে থাকা দুঃখটা বুঝি বুকের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠেছে।

মায়াদেবী একা, এটা ওটা বলে স্বাভাবিক পরিবেশ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাই শম্ভুনাথ চুপ করে ছিল।

ব্রজেনবাবু হঠাৎ বললেন, ঊর্মি, একটা গান কর। বড় ইচ্ছা করছে শুন্‌তে।"

ঊর্মিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরম্ভ করল,

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে,
দেখতে আমি পাইনি,
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।"

গানটা শেষ হতেই ব্রজেনবাবু এসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে নেমে গেলেন বাগানে। পিছে পিছে মায়াদেবীও গেলেন চলে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শম্ভুনাথ বলে উঠল, "কিছু মনে করবেন

না। আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আজকের সকাল, মনে হয় আপনাদের মনে কোন কিছু বড় ব্যথা দিচ্ছে। যদি না বলার মত হয়, নিশ্চয়ই বলবেন না। আমি জানি, আমাকে আপনাদের একজন মনে করেন। তাই মনে হয়, দুঃখের বোঝার ভাগ আমিও নিতে পারি"।

"নিশ্চয়ই পারেন, শম্ভুনাথবাবু। নিশ্চয়ই আপনাকে বলব।"

ধীরে ধীরে উর্মি তার সোনাপিসীর সব কথা বলছিল।

"আমি বিশ্বাস করি মিঃ মল্লিক, ভগবান এত কষ্ট করে যা সৃষ্টি করেন, তা দুঃখ পাক, কষ্ট পাক, কখনও তা তিনি চাইতে পারেন না। সে সব মানুষ করে সৃষ্টি। তবে আমি মনে করি, যে অন্যায় করে, আর যে তা মুখ বুজে সহ্য করে, তারা সমগোত্র। আগের কথা ছিল আলাদা। নিজে পায়ে চলবার ক্ষমতা হবার আগেই আগের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হোত। তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। কিন্তু এখন?"

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, "দিনকাল বদলেছে। উপযুক্ত হয়ে তবে তাদের বিয়ে হয় বা তারা বিয়ে করে। তা সত্ত্বেও যদি তারা অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করে ও ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, খুব কিছু সহানুভূতি আমি তাদের জন্য বোধ করি না। নিজের ভাগ্য জয় করবার অধিকার তাদেরই নিজহাতে তুলে নিতে হবে। জয় কেউ এনে দেয় না, নিজেকে অর্জন করে নিতে হয়।"

মল্লিক চুপ করে ওর কথাগুলো ভাবছিল গভীর ভাবে। ওর ইচ্ছে হোল যে যুগ যুগান্তরের চাপে তাদের থেকে যে মনুষ্যত্ব নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে, তা কি এক জেনারেশনে তারা ফিরে পেতে পারে? বাইরের সব কিছু তারা পেয়ে যাচ্ছে বা পাবে। কিন্তু অন্তর? তা যে বদ্‌লাতে কয়েক জেনারেশনের দরকার। তা সে অতি কঠিন। ব্যতিক্রম সব যুগেই ছিল, আছে ও থাকবে।

সেদিন ওরা তিনটার সময় বের হয়ে প্রথমেই গেল রাজারাণী মন্দিরে। শস্য শ্যামলা ধান ক্ষেত পরিবেষ্টিত এই মন্দিরটা অন্য সব

মন্দিরের চাইতে অনেকটাই আলাদা। কোমল ভাবপূর্ণ মনের অভিব্যক্তি। এটা যে সব শিল্পী করেছিলেন, তারা শুধু যে শিল্পের উৎকর্ষতার দিকেই নজর রেখেছিলেন, তা নয়, তারা তার সঙ্গে মিলিয়েছিলেন অন্তরের ভালবাসা।

তাই তার কারুকার্য সবাইকে করেন মুগ্ধ।

"আমার বড় ভাল লাগছে। আসুন, এখানেই একটু বসি। এখানেই বেশী সময় থাকি। আমরা কেউ ত আর রিসার্চ করতে আসিনি। আমাদের যা ভাল লাগে, তাই দেখি। কি বলেন, মল্লিক সাহেব?"

"জানিস উর্মি "ব্রজেনবাবু বললেন, "এই মন্দির রাজা বানিয়েছিলেন আনন্দ করবার জন্য। সবাই এলে, এখানে গান-বাজনা বা নাচ হবে। তাতে সবার মন যাবে খুশীতে ভরে। এটা আর সব মন্দিরের মত শুধু প্রার্থনা করবার মন্দির হিসাবে বানানো হয়নি।"

"আজকালকার সিনেমা-থিয়েটারেব মত আব কি. "মিঃ মল্লিক বলে উঠলেন।

"রাজার সত্যিকারের বুদ্ধি ছিল। শুধু প্রার্থনা আর ভগবানকে ডেকে যে মানুষও শুকনো কাঠেব মত হয়ে যাবে। তবে একটা কথা এখানে বলি"।

তিনি শুরু করলেন, "একজন বড় কবি ও কালিদাসের মধ্যে সত্যিকারের বড় কে, সে বিচারে বসেছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। সামনের একটা মরা কাঠ দেখিয়ে দু'জনকে বলেছিলেন, তোমরা এটা তোমাদের নিজস্ব ভাষায় বল।"

সেই কবি বলেছিলেন, শুষ্কং কষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"।

আর মহাকবি কলিদাস তাঁর সরস মিষ্টি ভাষায় বলেছিলেন, "নীরস তরুবরঃ পুরতো ভাতি।"

এটা আর সব মন্দিরের চাইতে পরে বানানো হয়েছে। এর কারুকার্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

একটু এগিয়ে গিয়ে ওরা ঢুকল আর একটি আম্রকুঞ্জের মধ্যে।

"এই সুন্দর পরিবেশে এসো আমরা সান্ধ্যভোজ শেষ করি।"

"কি ব্যাপার, ঊর্মিলাদেবী? আপনি কি আজকাল কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন নাকি?"

"সে গুড়ে পুরোপুরি বালি। দু'ছত্র মিলিয়ে লেখার চেষ্টা কখনো করিনি। জানি আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়।"

"একি কথা বললেন? আজকাল ত সে যুগ চলে গেছে। আজকাল মিলিয়ে লিখলে যে তা হয়ে দাঁড়াবে পদ্য। আজকাল ত সবাই ডি, এল, রায়-এর একটা কবিতা সর্বান্তকরনে মেনে চলেছে।"

সবাই তাকাল ওর দিকে।

'একটা কিছু কর।' তাই দিশেহারা কবিরা গদ্য লিখে বলছে পদ্য।

শম্ভুনাথের বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল।

আমের বনে ঘুরে ঘুরে ওদের সবার এত ভাল লাগছিল, সেদিন আর কোথাও না গিয়ে, যতক্ষণ সম্ভব ওরা ওখানেই ঘোরাঘুরি করল।

পরেব দিন সকালে উঠে ব্রজেনবাবু বললেন, "আজ তোমরাই তিনজনে বরঞ্চ ঘুরে এসো। আমার মনে হচ্ছে একটু বিশ্রামের দরকার। ক'দিন সমানে ঘোরা হ'ল ত। কলকাতা থেকে শুরু হয়েছে।'

"বেশ ত। তুমি বিশ্রাম নাও। আর আমরাও তোমার দেখাদেখি কিছু বিশেষ না করার আনন্দ পাই।"

"কি পাগলি মেয়ে। এই নূতন জায়গাতে কেন একটা দিন নষ্ট করবি? মায়া না হয় থাক। তোরা ঘুরে আয় গিয়ে।

"না, তা হয় না বাবা। সবাই মিলে এসেছি, সবাই মিলে করব যা কিছু। তাই বিকেল বেলা চারজনে ব্রিজ খেলা যাবে। কতদিন খেলা হয় না।"

"বেশ, তাই হবে।"

ব্রজেনবাবু শোবার ঘরে গিয়ে আরাম করে আধো শুয়ে সঙ্গে আনা একটা বই পড়তে আরম্ভ করলেন। বন্ধু অবিনাশের মত কোন একটা বিশেষ বিষয়ে গবেষণা করা—তা উনি করেন না। সব রকম বই

পড়েন। যখন যেটা ভাল লাগে। যখন যেটা মন চায়, ভাল লাগার আনন্দে পড়েন।

ভাবেন, কি হবে বিশেষ করে, বিশেষ ভাবে কোন কিছু করে? ক'দিন আর আছেন এই পৃথিবীতে? সামনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সারা জীবনই ত এটা সেটা করেছেন। ফলে কি হয়েছে? যা হবার ছিল, তাই, বোধ হয় হয়েছে।

বড় ছেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, বলতে গেলে, জীবনের প্রায় সবই চিন্তা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চয় ঢেলে নিয়েছিলেন। কিছু কি পেলেন? যে নিজের জন্য বড় হয়েছে। পরিবার হ'ল বঞ্চিত।

মেয়ের বিষয়ে বিশেষ কিছু ভাবেন নি বা করবার চেষ্টা করেন নি। ভাল একটা বিয়ে দেবেন এ কথা অবশ্য ভেবেছেন। সেই এখন দাঁড়িয়েছে তাদের দু'জনের জন্য, তাদের বল, ভরসা। ছোট ছেলে নিজের চেষ্টাতেই দাঁড়িয়েছে। অবশ্য, চিন্তা করেও তাদের। কিন্তু তার মধ্যে নিজের চিন্তাও করছে; যেটা স্বাভাবিক। এখনি বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সেই চিন্তার পরিধি বেড়েই চলবে দিন দিন।

কিন্তু এই মেয়েটা নিজেকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করে তিন জনের দেনা যেন একা শোধ করবার ভার নিয়েছে। কেউ ত তাকে বলেনি। বয়স্ক, তারা দু'জনে কত সময় ওকে বুঝিয়েছেন নিজের কথা ভাবতে। তাদের জীবন কাটালেই চলবে?

একই উত্তর শুধু পেয়েছেন, "সবাই যদি শুধু নিজেদের কথা ভাবে, তবে পৃথিবীটাতো পৃথিবী থাকবে না। আর তাছাড়া সবার আনন্দ ত এক ভাবে হয়না। কারো নিয়ে কারো দিয়ে। কেউ ভাবে দৈহিক আনন্দই শ্রেষ্ঠ। কারও কাছে মনের তৃপ্তিই বড়। এ সব ত ভগবানের সৃষ্টি। এর মধ্যে বড় ছোট কিছু নেই। তোমাদের নিয়েই আমি পাই আনন্দ।"

একটু চুপ করে থেকে উর্মি আবার বলেছে, "তুমি বলবে, তোমরা আর ক'দিন। তারপর? এটা ত বিশ্বাস কর, একক জীবন

যদি আমার ভাগ্যে থাকে, কেউ খণ্ডন করতে পারবে? মল্লিক সাহেবকে দেখ। খুব দূরে তাকাবার দরকার নেই।"

নানা ভাবে বুঝিয়ে দেখেছেন; কিন্তু এক ধরণেরই শুধু উত্তর পেয়েছেন। আজকাল বড় একটা কিছু বলেন না। দেখলেন ত চেষ্টা করে। কিছু হয় না। যা হবার তাই হবে।

মায়াদেবী এসে ঢুকলেন ঘরে, এক কাপ চা হাতে। স্বামী চা খেতে ভাল বাসেন। তাই।

"ওরা কোথায়?"

"বারান্দায় বসে গল্প করছে। ঊর্মি বলছিল, কালকেও আমরা দূরে না গিয়ে কাছাকাছিই একটু হেঁটে বেড়াব, আর শম্ভুনাথের বন্ধুর বন্ধু মিঃ পাত্র, যে আমাদের গাড়ী দিচ্ছে, তাকে ও তার স্ত্রীকে রাতে এখানকার যে বড় হোটেলটা আছে, সেখানে রাতের ডিনার খাওয়াব।"

"ভালই হবে। তাছাড়া একদিন ওদের বাড়ীতেও খাইয়ে দিও। মানুষকে খুশী করার এটাই বোধ হয়, সব চাইতে সহজ পথ।"

মায়াদেবী একটু হাসলেন,—"অনেক্ষণ ত বই পড়ছ। এখন বেখে দাও না। এসো, আমরা গল্প করি।"

এ ধরনের কথা, স্ত্রীর কাছ থেকে আজকাল কমই শোনেন। স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন।

মেয়ে পেয়েছে মার চেহারা, শ্যামলা রংটা তার থেকে। কতদিন যেন এরকম ভাবে মায়ার দিকে ফিরে চাননি। সত্যই, মিষ্টি চেহারাটা দুঃখে কষ্টে কত ভেঙ্গে গেছে।

তখনই মনে হোল, ঊর্মি বিয়ে না করে বুঝি ভালই করছে। সংসারে কি শুধু সুখই পাওয়া যায়? জীবনের আরম্ভে তাদের সামনে ছিল কত আশা। শেষে সব আশা ভঙ্গ।

"কি এত দেখছ?

"দেখছি মায়াকে।"

"দেখবার আর কিছু নেই।"

"কেন এ কথা বললে, মায়া? যৌবনে থাকে বাইরের চাকচিক্য।

এখন হচ্ছে অন্তরের সৌন্দর্য। এখন প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার ভালবাসা উপলব্ধি করি। তখন তোমার স্পর্শ, তোমার সান্নিধ্য ছিল আমার কাছে বোধ হয় বড়। তাকে আমি খাটো করছি না। সবই ভগবানের দান, সৃষ্টি। কিন্তু এটা ত স্বীকার করতেই হবে, সে সব ফুরিয়ে আসে আর অন্তরের ভালবাসা বেড়ে চলে।"

এ সব কথা মায়ার বড় ভাল লাগছিল শুনতে। চায়ের মান গেল ঠাণ্ডা হয়ে টিপয়ের উপর। ছ'জনে ছ'জনের মনের অতল গভীরে ধীরে ধীরে যেন তলিয়ে গেল।

"আচ্ছা মিঃ মল্লিক, আপনার শ্বশুর বাড়ীর কথা ত কোন দিন কিছু বলেন না?"

"বলবার বিশেষ কিছু নেই বলেই বলিনা।"

"ওদিকে কি কেউই নেই?"

"থাকবে না কেন? আছে। সেখানেও বলতে গেলে সেই অল্প বয়সের পাগলামী চাড়া দিয়ে উঠেছিল। জানেন ত, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে চাক্‌রীতে দিয়েছিলাম ইস্তফা।"

"তাও শুনেছি।"

"আমার স্ত্রী ছিলেন খুব সুন্দরী। বাইরের সৌন্দর্যকে দেখেই মা-বাবা গরীবের ঘর থেকে তুলে এনেছিলেন। আমার ভাগ্যে দেখলাম, বাইরেই শুধু সুন্দর ছিলেন না, অন্তরেও ছিলেন সুন্দর। যাক্ সে কথা। জানতে চাইলেন, তাই বলি। মেয়ে মারা যাবার পরে ওঁরাও ভেঙ্গে পড়লেন। গেলাম তাদের কাছে। ক'দিন থেকে সান্ত্বনা পাবার জন্য। তার বদলে পেলাম বড় রকম একটা ধাক্কা। ওঁরাও অন্যদের দিয়ে স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তাব দিলেন। এত আঘাত পেয়েছিলাম যে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে এসেছিলাম— জীবনে কোন দিন ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম দারিদ্র্যই যে কত বড় অভিশাপ। মানুষকে তা মানুষ থাকতে দেয় না। পেটের জ্বালার চাইতে বড় জ্বালা ছনিয়াতে আর কিছু নেই। ওঁরা যে বড় গরীব ছিলেন।"

শম্ভুনাথ একটু থেমে আবার শুরু করল, "বিলেত থেকে পরে

অনেক টাকা পাঠিয়েছিলাম ছোট মেয়ের ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিতে। ভাল বিয়ে হয়েছে। ওরা সুখে আছে। আমার স্ত্রীর বড় বোন অল্প বয়সে বিধবা। আমার সাহায্যে উর্মি বি, এ, বি, টি, পাশ করে মফস্বলের একটা স্কুলের টিচার। বিলেত থেকে আসার পরে ওঁদের একটা মাত্র ছেলে এসে চাকরীর জন্য দাঁড়িয়েছিল। তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমার এক বন্ধুর সাহায্যে। সবাই এখন ভালই আছে। তবে আমি কোন সম্পর্ক রাখি না। বোঝেন কি না জানি না, যাকে দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক, সেই নেই। ক'দিনই বা ছিল।"

একটু চুপ করে থেকে উর্মিলা বলল, "আপনি লোকটা কিন্তু ভাল।"

হেসে ফেলল শম্ভুনাথ, "কেন, আমাকে কি এতদিন খুব খারাপ বলে মনে হয়েছে আপনার ?"

"না, ঠিক সেভাবে কিন্তু আমি বলিনি।"

"আপনি বলতে চেয়েছিলেন, আপনি যে সুবিধের লোক নন মোটেই, তাইত জানতাম। হঠাৎ দেখি কিছু ভাল কাজও করেছেন।"

উর্মিলা একটু চটেই বলে বসল, "আপনি যদি এ রকম ভাবে সব কথা ঘুরিয়ে বলেন, তবে আমি এই চুপ করলাম।"

শম্ভুনাথ হঠাৎ ওর হাতটা ধরে ফেলল, "প্লিজ্, রাগ করবেন না।"

উর্মিলা ভাবতেই পারেনি যে শম্ভুনাথ এমন ভাবে ওর হাত ধরবে। এই একটু ছোঁয়ার স্পর্শে মনে হোল যেন তার সারা শরীরে একটা নূতন প্রাণমন্ত্রের আভাস। ইচ্ছে হোল হাতটা বাড়িয়ে সে আর একটা হাত ধরে।

চকিতে সে একবার চাইল মল্লিকের দিকে। তার মনের কথা, তার দু'চোখের ভাষায় সে পড়ে ফেলেনি ত ?

দেখল, মিঃ মল্লিক তার মুখের উপর থেকে চোখ দু'টি সরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে।

যাক্, উর্মিলা নিশ্চিন্ত হোল। তার ক্ষণিকের আসা গোপন কথা গোপনই রয়ে গেছে। আস্তে করে সে নিজের হাতটা সরিয়ে নিল।

"বেশ, আপনার কথাই আমি মেনে নিলাম। বিশ্বাস করুন মিঃ, মল্লিক, আপনাকে আমি প্রথম থেকেই ভাল মনে করেছি। না হলে, এত বছর শুধু স্মৃতি নিয়ে সাধারণ লোক থাকে না। এটাও ঠিক, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আপনি বুঝি একটু ভাসা ভাসা। কোন কিছুর গভীরে যেতে চান না বা পাবেন না।"

পরে সে আরো বলল, "এটা মনে করাটা আমার সত্যিই ঠিক হয়নি—তাও আবার ভেবেছি। কখনও মনে হয়েছে, আপনার মধ্যে বুঝি দুটা সত্ত্বা আছে। তাই আপনি পারেন আপনার এখনকার পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে।"

"ঠিকই ধরেছেন, উর্মিলা দেবী। পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে চলতে না পারলে শুধু ধাক্কা খেতে হয়। তবে সত্যি কথা আপনাকে বলব, একা যখন থাকি, কষ্ট পাই। ভাল লাগে না এই পরিবেশ, যেখানে নেই এতটুকু অন্তরের পরশ। জানেন ত, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। মনটাও মধ্যবিত্ত। জোর করে তাকে,"....একটু থামলেন মিঃ মল্লিক।

"না, আজ থাক। অন্য কথা বলা যাক্, কি বলেন?"

উর্মিলারও মনে হোল, সেটাই ভাল হবে। সে ঘাড় নাড়ল।

"তাই ত, আপনার মা-বাবা কোথায় গেলেন, দেখুন ত?"

উর্মিলা উঠে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। মা বাবা, দু'জনেই চুপ করে বসে আছে, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। মুখে দু'জনেরই শান্তির ভাব ফুটে উঠেছে, যেন অনেক কিছু ভেবে শেষে

পেয়েছে শান্তির পথ। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ইচ্ছে হল না পরিবেশটা নষ্ট করতে। এসে বসল ড্রইংরুমে।

নিজের কথাও বুঝি ভাববার সময় এসেছে। বেশ অনেক দিন তার কাটল একভাবে। মনে কখনো কোন চঞ্চলতা অনুভব করেনি। অনেক ছেলে বন্ধু তার আছে। সবাইকেই তার ভাল লাগে। তাইত তাদের বন্ধুর পর্যায়ে স্থান দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ বারে বারেই তার মনে হয়েছে, তাদের থেকে দু'জনকে কি সে একটা বিষয়ে স্থান দিচ্ছে না?

ডঃ গাঙ্গুলী আর মিঃ মল্লিককে?

কিন্তু কেন?

তার মনের কি রকমফের হতে আরম্ভ হয়েছে? তার অবচেতন মনে কি সে বোধ করছে তার দিন চলে যাচ্ছে? চেনা জানা সকলেই বসন্তের আবাহনকে দূরে সরিয়ে রাখেনি? বন্ধু মল্লিকা; সেও তার ডাকে সাড়া দিয়েছে! সে তার প্রিয়তম ইন্দ্রজিতের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে; কিন্তু তার সঙ্গে রেখেছে তার নিজের সত্ত্বাকে।

সে কি করবে এখন?

পর মুহূর্তেই তার মনে হল না, এখন তার এই নিয়ে এত মাথা ঘামাবার সময় হয়নি। শম্ভুনাথের স্পর্শ তার শরীরে যে শিহরণ জাগিয়েছিল, তা হতে পারে একটা সাময়িক উত্তেজনা। পুরুষের আকর্ষণ যা সর্ব যুগে মেয়েদের করেছে দিশেহারা। তার মধ্যে সত্যিকারের মনের বন্ধন না থাকলে, তা হয়ে দাঁড়ায় শুধু যৌন আবেদন। তাকে প্রেম বা ভালবাসা বলা যায় না। তার শিকার হবার মন বা বয়স, কোনটাই তার নেই।

এখন নিজেকে তার বেশ হাল্কা বোধ হল। নিজের সত্যরূপকে যেন সে প্রথম করল উপলব্ধি।

সে আর দশ জনের মত নয়। সে আলাদা। সে নিজেকে চেষ্টা করে বুঝতে, জানতে, ধরতে।

সে বুঝল, তার মনের অগোচরে রয়েছে ঘর বাঁধার বাসনা। সেই অনুভূতি কারণে অকারণে তাকে দেয় ব্যথা, তাকে দেয় ভয়?

হবেও বা।

এই ভাবনাটাই কি তাকে এর থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে? নিজেকে সে ভাল করে চিনতে চেষ্টা করবে। সাধারণ মেয়েদের মত না বুঝে, না জেনে সে কোন কিছুতে এগিয়ে যাবে না।

মিঃ মল্লিকের পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকাল।

"মিস্ রায়, আপনি এখানে? আমি এদিকে আশায় আশায় বসে আছি।"

ততক্ষণে ঊর্মি নিয়েছে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে। ধরা সে কখনো নিজেকে দেবে না। তার কাছে অপর পক্ষ ধরা দেয়। তাতে সে অভ্যস্ত। কত মিষ্টি মিষ্টি কথা সে দু'কান ভরে শুনেছে। তাকে অনেকেরই ভাল লাগে। অনেকেই ভালবাসায় পড়বার জন্য প্রস্তুত। তার মনকে কেউ ছুঁতে পারেনি। তাইত সহজেই সব কথা তার কান দিয়ে ঢুকেছে যেমন, বেরিয়েও গেছে তেমনি। তাই তার বান্ধবীরা কত সময় বলেছে,—"তোর হৃদয় বলে কি কিছু নেই?"

হেসে সে উত্তর দিয়েছে,—"বোধহয় আছে, বোধহয় নেই। তোদের সকলের মত আমার অবসরের অভাব। মনের আদান প্রদানের সময় লাগে। আমি অভাগী ত। পায়ে চাকা এঁটে ঘুরছি।"

"আহা মরি মরি! কি কথা! সবাই পেল সময়।"

হেসে ঊর্মিলা বলেছে,—"আমারও সময় হবে। সেদিন অতিথি আসবে দ্বারে।"

"সত্যি, তোর সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না," বলে বান্ধবীরা গেছে চলে।

"মিঃ মল্লিক, ঘরে ঢুকে দেখি দু'জনে চুপচাপ বসে যেন কি এক ধ্যানে রয়েছে। তাই চুপ করে বেরিয়ে এসে এখানে বসে পড়লাম। একটু পরে গিয়ে ধ্যান ভঙ্গ করবার ইচ্ছে। জানকী বলে গেল, দুপুরের খাবার তৈরী।"

শম্ভুনাথ কিছু না বলে বসবার ঘরেই বসে পড়ল। খুব ইচ্ছা

করছিল তার বলতে যে,—দু'জনে একা একা কোথাও যাই, যেখানে আপনাকে আমার কথা বলি। তা আর বলা হল না।

তার ভাল লাগে উর্মিকে। কিন্তু বলা হয় না। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে তার ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিল যাকে, তাকে যে ভগবান হঠাৎ তুলে নিয়ে গিয়েছেন। তাই, তার প্রথম ভয় হয় উর্মিলাকে কোন কিছু বলতে।

অন্যদের বলতে কোন বাধা নেই। সে জানে, বিধাতা ঠিক বুঝে নেয় আসল আর নকল কে। উর্মিকে সে যা বলতে চায়, তা যে তার মনের কথা, জ্ঞানের কথা। তারপরে যদি উর্মি হারিয়ে যায় তার জীবন থেকে চিরকালের মত। তখন?

না, থাক। এই বেশ। একটু কথা, একটু ছোঁয়া, একটু হাসির টুকরো এই নিয়েই চলবে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মিঃ ও মিসেস পাত্র এসেছিলেন তাদের বাড়ীতে সবাই মিলে খুব গল্প হল। তারপর হোটেলে সকলে গিয়ে রাতের খাবার খাওয়া হল। ফেরার পথে ব্রজেনবাবু বললেন, শম্ভুনাথ, তোমার বন্ধুটা বেশ। দু'জনকেই বেশ ভাল লাগল। বাংলা জানে বেশ ভাল।"

"দু'জনেই যে কলকাতাতে পড়াশুনা করেছে।"

পরের দিনের প্রোগ্রামটা আগের দিন হয়ে যাওয়াতে, আর সকালে উঠে ব্রজেনবাবু তাজা বোধ করাতে, তিনটার সময় মোটরে করে কোথাও যাবার কথা আলোচনা করছিল সকলে।

"কোথায় যাওয়া যায়, তুমি বলত বাবা।"

"তোরাই ঠিক কর," মায়ার দিকে তাকালেন ব্রজেনবাবু।

মায়াদেবী ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল জানকী আর মালীর সন্ধানে। সঙ্গে কি যাবে, রাতে কি হবে, সবই ত হাতাহাতি ব্যবস্থা করতে হবে।

উনি মেয়েকে মোটে এদিকে আসতে দেন না। সারা বছর বড় খাটে মেয়েটা। একটা দিন গল্প করে হেসে বেড়িয়ে বেড়াক মেয়েটা।

মায়ের মনের কোনে একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি দেয়, এমন সুন্দর স্বভাবের ছেলেটা সত্যিকারের যদি ছেলে হয়ে একদিন উর্মির হাত ধরে এসে দাঁড়ায়।

সেদিন ওরা সকলে গেল লিঙ্গরাজ মন্দির দেখতে।

"এই মন্দিরটাকে ভারতবর্ষের সবচাইতে সুন্দর মন্দির বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে," মিঃ মল্লিক বলল।

এর স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে সকলেই হোল স্তম্ভিত।

"কি দারুণ উঁচু। নিশ্চয়ই এটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়?"

"ঠিকই বলেছেন, মিস্ রায়। এখানে কিন্তু হিন্দু ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। জানেন ত, লর্ড কার্জন ছিলেন স্থাপত্যবিদ্যা প্রেমিক। উনি এটা ভাল করে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর দেখবার সুবিধার জন্য একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয়েছিল। সেখান থেকে উনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছিলেন"।

শম্ভুনাথের কথা শুনতে শুনতে সকলে গিয়ে ঢুকল দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে। সেই প্রাঙ্গণের মধ্যে হচ্ছে লিঙ্গরাজ মন্দির। এই মন্দির ঘিরে রয়েছে অনেকগুলি উৎসর্গীকৃত ছোট ছোট মন্দির। লিঙ্গরাজের অপূর্ব সৌম্য মূর্তির দিকে তাকিয়ে চারজন যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

তাই বুঝি হয়। সত্যের দিকে তাকিয়ে, সুন্দরের দিকে তাকিয়ে অন্তরে আসে এক অনুভূতি যা মূক করে দেয়, অল্প সময়ের জন্য হলেও। শিবের শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে মন হয়ে ওঠে উদাস, বিভোর। আস্তে আস্তে ওরা বেরিয়ে এলো মন্দির থেকে।

বেরিয়ে এসে উর্মি বলল, "মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। চারিদিকের গতানুগতিক জীবন যাত্রার দৃশ্য আর দেখতে ইচ্ছে করল না।"

"ঠিকই বলেছেন, উর্মিলাদেবী। যা পাইনা, যেখানে যাওয়া শক্ত, তাই আমাদের টানে। আমরা তাই ছুটে চলেছি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। লাভ হবে কি লোকসান হবে, সে ভাবনা আমাদের নেই। যা পাইনি,

সেটা পেতে হবে, এই লক্ষ্য ধরে মানুষ চলছে। কেন পাব না? কেন জানব না? সেই বিরাট জিজ্ঞাসা তার অন্তরে।"

চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ওরা অনেককিছু দেখল। দাঁড়াল এসে পার্বতীর মন্দিরে। সকলেরই মনে এল একই কথা,—একই সঙ্গে লিঙ্গরাজের বিরাট মন্দিরের কাছে যদি এই মন্দির না থাকত, তবে এর উজ্জ্বলতা সবার চোখে পড়ত। এই মন্দিরটা মনে হয়, একটা নবরত্ন। এর সূক্ষ্ম কাজ আর সবকিছুকে যেন আঁধারে ফেলে দিয়েছে।

"মনে হয় না মা, এই ছোট্ট মিষ্টি পার্বতীদেবীর মন্দিরটা যারা করেছে, তারা প্রেম দিয়ে করেছে, প্রাণের টানে করেছে? তাই বোধ হয়, এ তুলনাহীন।"

"হবেও বা", মায়াদেবী বললেন।

"আমার ইচ্ছে করছে, যদি সম্ভব হোত, পুঁথি-পত্তর ঘেঁটে এই কথাটা ঠিক বের করতে পারতাম, আমার মন যা বলছে তাই ঠিক"।

ব্রজেনবাবু তার ভাবুক মেয়েটার দিকে সস্নেহে চাইলেন। বিন্দু-সাগরের পাড়ে এসে সবাই বসল।

ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে একটু জিরিয়ে নিয়ে মিঃ মল্লিক বললেন, "আস্তে আস্তে বোধ হয় মনকে বাদ দিয়ে অন্য দিকটাও ভাবা দরকার।"

"ঠিক বলেছেন; কিন্তু আপনার ওপর আমার বেশ রাগ হচ্ছে। দিলেন ত মনে করিয়ে চায়ের কথা। মনে আসতেই মাথাটা চন্‌চন্ করে উঠল। এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি যে চায়ের সময় হয়ে গেছে।"

সবাই সমস্বরে চা'-এর পিপাসার কথা বলাবলি করতে করতে মোটরে এসে হাজির হোল। মোটরে আরাম করে বসে খাওয়া সাঙ্গ করে উর্মিলা আর শম্ভুনাথ গেল এদিক সেদিক একটু ঘুরে বেড়াতে।

কারো মুখে ছিল না কোন কথা। মনে ভাবনাও বোধ হয় ছিল না। কোন কিছু না থাকার আবেশটাই বুঝি শুধু ছিল। এসে বসল দু'জনে একটা পাথরের উপরে। অতি কাছাকাছি; কিন্তু দেখে মনে

হয়, নিকটের অস্তিত্বটা এরা জানে না। বোঝে না তার গুরুত্ব।
তাই বুঝি অনায়াসে বসেছে অত কাছাকাছি।

আঁচলটা হাওয়াতে উড়ে গিয়ে লাগছে শম্ভুনাথের গায়ে। কখনও কি শম্ভুনাথের নিঃশ্বাসের হাওয়া লেগে উর্মির কপালের চুলগুলো নড়ে চড়ে যাচ্ছে?

শম্ভুনাথ হঠাৎ বলে উঠল, "উর্মিলাদেবী, আপনার কথা ছিল গান শোনাবার কথা কিন্তু আপনি রাখেন নি।"

"আমি রাখিনি, না আপনি রাখেন নি? কথা ছিল, অনুরোধ করলেই আমি গাইব। করেছেন অনুরোধ, আর আমি গাইনি? হয়েছে সেরকম, বলুন?"

হেসে মল্লিক বলল, "অপরাধ স্বীকার করে নিলাম," বলে হাতটা রাখল ওর হাতের উপরে।

উর্মিলা এবারে আস্তে করে নিল হাতটা সরিয়ে, ও চায়না দোটানাতে পড়তে। তার জ্বালা অনেক। কখনও যদি তার মন সত্যিই সঙ্গী চায়, তখনই সে কথা ভাববে তাই আস্তে করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে ঠিক হয়ে বসে গান ধরল :—

"তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি, সুরে সুরে, তালে তালে।"

শম্ভুনাথের গানটা বড় ভাল লেগেছিল। এই শান্ত গানটা, করে দিল তাকে অশান্ত। তার মন চাইল উর্মিকে বলতে সেই মন কথা, যা মনে মনে বলেছে অনেক বার। কিন্তু বলতে গিয়ে দেখল যে তেমন ভাবে পারল না বলতে।

"মিস রায়, আপনার কি মনে হয়, এই গান কবি লিখেছিলেন নিজের মনের কথা ব্যক্ত করবেন বলে? না, যে শুনবে বা গাইবে তার কথা?"

উর্মিলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,
—"উনি মনে হয় কোন বিশেষ কারও মনের কথা লেখেন নি। উনি

এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বাণীতে। সুরের মুর্চ্ছনায়। "তাই-ত সবার মনে হয়, বুঝি তারই কথা ভেবে কবি লিখেছেন।"

"তাই হবে। কিন্তু ভাবতে ভাল লাগে, বুঝি আমার জন্যই বিশেষ করে লেখা। যাক্, সে কথা না হয় নাই ভাবলাম কিন্তু আমার জন্য গাইলেন, তা কি ভাবতে পারি?"

উর্মিলা যেন কি উত্তর দেবে, ভেবে পেলনা। সেদিন সকালে তার যেমন মনটা হয়েছিল উদ্‌ভ্রান্ত, আজ কি শম্ভুনাথের তাই হয়েছে?

অনেক ভেবে শেষে বলল, "আমার কি মনে হয় জানেন, এই গানটা মনে আমার উপলক্ষ্য বোধ হয় পার্বতীদেবী। গাওয়ার জন্য পুরোপুরি লক্ষ্য হচ্ছেন আপনি। কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরতে থাকত ঠিকই, কিন্তু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসত না, যদি আপনি অনুরোধ না করতেন।"

"আপনি বেশ কৃপণ, না? এক কানা কড়িও ফাউ দিতে রাজি নন।"

বার

মিঃ মল্লিক হেসে উঠলেন।

উর্মিলাও তাড়াতাড়ি হাসিতে যোগ দিয়ে যেন বেঁচে গেল।

দু'জন হাঁটতে হাঁটতে এসে মোটরের কাছে হাজির হোল।

মোটরে বসে মিঃ মল্লিক বললেন, "ব্রজেনবাবু, চলুন না, বাড়ী গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আজকে অল্প সময়ের জন্য ক্লাবে গেলে কেমন হয়?"

"ভালই ত। তবে, আজও বেশ বেড়ান হোল। বরঞ্চ তোমরা যাও।"

"আজকে থাক্‌না মল্লিক সাহেব; তার চাইতে কালকে সন্ধ্যেবেলা একটু তাড়াতাড়ি ওখানে যাওয়া যাবে। মিঃ পাত্রের গেষ্ট হয়ে সবাই খেলা যাবে, খাওয়া যাবে। অবশ্য টাকাটা আমি দেব।"

"খুব ভাল হবে। দি আইডিয়া। বাড়ী গিয়েই পাত্রকে চিঠি পাঠিয়ে দেব মালীর হাত দিয়ে। ওঁরা ব্রিজ খেলবেন।"

বাধা দিয়ে উর্মি বলল, "আর আপনারা নাচবেন, আমি দেখব।"

দুষ্টুমিভরা চোখে শম্ভুনাথ চাইল উর্মির দিকে, "দেখা যাবে. কে কি করে কালকে।

কালকের ব্যবস্থাটা সকলেরই মনঃপুত হওয়াতে মনে হোল, তাই বুঝি কারো মুখে কোন কথা ছিলনা। হুস্ হুস্ করে গাড়ী ছুটে চলেছে। কারো চোখ বোঁজা, কারো চোখ খোলা। কিন্তু মনের দরজা বন্ধ।

উর্মিলা বসে বসে ডঃ গাঙ্গুলীর কথা ভাবছিল। আজকে সকালেই তার চিঠি পেয়েছে। এখানে আসার আগে ওকে আর মল্লিকে চিঠি দিয়ে এসেছিল। মল্লির কোন জবাব পায়নি। স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। বাড়ী ভর্তি লোক। হঠাৎ মনে হোল, কারও অসুখ করেনি ত? না নিশ্চয়ই। ডঃ গাঙ্গুলী লিখেছেন—ওরা বেড়াতে গেছে, সকলে তাতে খুশী হয়েছেন। অবশ্য একথাও লিখেছেন,—"আপনাকে, না, মানে আপনাদের সকলকে সঙ্গী করে এক-আধ দিন সন্ধ্যেবেলা পূজো দেখতাম। তা হোল না। বোনটাকে বাড়ীতে রেখে কোন কিছু করতে মন চায় না।"

যাক্, এটা সেটা লেখার পরে সে লিখেছে, "কলকাতা এসেই জানাবে। উৎসুক হয়ে থাকব।"

ডঃ গাঙ্গুলীর কথা মনে আসতেই মনটা গেল দুঃখে ভরে। এ ভাবে কি করে দিন কাটবে? বোনটারই জীবন কাটানও ত আস্তে আস্তে দুরূহ হয়ে উঠবে।

সে মনে মনে ঠিক করল, এবার ফিরে গিয়ে নিজের সময় থেকে নিজেই চুরি করে নেবে কিছুটা সময়। চেষ্টা করবে বোনটার সঙ্গে দেখা করতে, ভাব করতে, টেনে আনতে তাকে স্বাভাবিক জীবনে।

মনে এলো একটা আইডিয়া—ভাল ভাল বিউটি সেলুন আছে কলকাতায় পার্কষ্ট্রীটে। সে বা মল্লি কোনদিন সেখানে যায়নি, যখন তাদের বয়সটা ছিল সত্যিই কম অনেক টাকা লাগে। বড়লোকেদের

মেয়েরা, বৌরা সেখানে আনাগোনা করে। আর করে চিত্র তারকারা।

সে তার কোনটাই না। তাই আর কোনদিন যাওয়া হয়নি। এখন অবশ্য হু'জনেরই যা রোজগার, তাতে সখের জন্য এক-আধ বার যাওয়া চলে। কিন্তু সেই কচি বয়সটা আর নেই।

যাক্‌গে নিজেদের কথা। দরকার হলে মল্লির কাছ থেকে টাকা নিতে হবে। পরামর্শও নিতে হবে। এই বাচ্চা মেয়েটার জন্য একটা কিছু পথ বের করতে হবে। তখনই মনে হোল, নিজেদের হুঃখটাই আমরা বড় করে দেখি।

আহা, ডঃ গাঙ্গুলী ও তার বোন এই জীবনের মধ্যে যে হুঃখ পেয়েছে, সে তুলনায় আমরা ত ভগবানের বরপুত্র। আমাদের বেশী চেনার মধ্যে এরকম পোড়া কপাল বুঝি আর কারও নেই। না, কারো কথা ভেবেই সে মনকে হুঃখিত করবেনা।

সে সহযাত্রীদের দিকে ফিরে তাকাল। বাবা একমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। মিঃ মল্লিক ড্রাইভারের পাশে বসা। তাই তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ভুবনেশ্বরের ক্লাবে গিয়ে উর্মিলা যেন তেমন তৃপ্তি পেল না।

ক্লাব কথাটার সঙ্গে যে ধারণা তার ছিল, তা অনেকটা উল্টে গেল। মনে হোল, সাধারণ লোকেরা ক্লাবটাকে মনে মনে কিছুটা নাইট ক্লাবেব রূপ দেয়। তারও, বোধ হয়, একটুখানি সেই ধারণাই ছিল। তাই মনের মধ্যে একটা দ্বিধা বোধ করছিল মা-বাবাকে সেখানে নিতে।

পরে ভেবে দেখল, তার চাইতে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারা। সে যেখানে যেত পারে, তারা কেন পারবে না? তার চাইতে যারা বয়সে ছোট, অনভিজ্ঞ, তাদের জন্য এ ভাবনা আসতে পারে।

সেখানে ঢুকে উর্মিলা মনে একটা শক পেল। এও বেশ শান্ত, ভদ্র জায়গা। একটি ঘরে বসে কয়েকজন মন দিয়ে ব্রিজ খেলছে। সেখানেই ওদের মিঃ ও মিসেস্ পাত্র নিয়ে গেলেন। একটা টেবিলে

কয়েকজন খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল, যাতে যারা কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলছে তাদের যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়।

ওরা মনে হোল, সঙ্গীর অভাবে খেলা আরম্ভ করতে পারছিল না। মিঃ ও মিসেস রায়কে পেয়ে খুবই খুশী হোল। মা-বাবাও খুশী। অবিনাশবাবু যাবার পর ওদের তাসের আড্ডাতে পড়েছিল ভাঁটা। সোৎসাহে ওরা খেলা আরম্ভ করে দিল মিসেস্ পাত্রও খেলতে বসে গেল

মিঃ পাত্র শম্ভুনাথ ও উর্মিকে নিয়ে অন্য ঘরে এসে ঢুকল। উর্মিলা ভেবেছিল এখানে জোরে জোরে জ্যাজ্ বাজবে নাচ চলবে নানা ধরনের টুইষ্ট নাচ, বলরুম ডানসিং, ইত্যাদি। অবাক হয়ে দেখল কোথাও কিছু নয়

ছোটলা পাকিয়ে এক একটা গ্রুপ হয়ে সব আড্ডা হচ্ছে। টিপয়ের ওপর রাখা আছে কারো সরবতের গ্লাস, কারো বা ওয়াইন গ্লাস। নেশা করবার জন্য মদ গিলছে সেরকম কাউকে নজরে পড়ল না।

সামনে কিছু না থাকলে আড্ডা তেমন জমে না। তাই বুঝি এক একটা গ্লাস সামনে। হঠাৎ নজরে পড়ল দূরে একটা কোনে একটা ইংরেজ এক মনে গ্লাসের পর গ্লাস ওয়াইন গিলে যাচ্ছে।

"ওদিকে বোধ হয়, না তাকানই ভাল," মিঃ পাত্র বললেন।

"কেন বলুন ত? আর তাছাড়া অমন করে মদই বা খাচ্ছে কেন!" শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করল।

"ও কলকাতার একটা বিদেশী ফার্মের বড় সাহেব পরিবার থাকে বিলেতে। বেড়াতে এসেছিল গতকাল। দু'তিন দিন থাকবার কথা ছিল সব গোলমাল হয়ে গেছে। একটু আগে কেবল এসেছে, ছেলের খুব অসুখ। হঠাৎ খবরটা ওকে কেমন করে দিয়েছিল। কাল ভোরের প্লেনে কলকাতা পৌঁছেই লণ্ডনের জন্য রওনা হবে।"

"আমি খুব বুঝতে পারছি, একা বিদেশে এরকম অবস্থায়" শম্ভুনাথ চুপ করল।

উর্মিলা বেশ চুপচাপ ছিল। ওর বারে বারেই মনে হচ্ছিল, না

জেনে কোন কিছু ভাবা বা বলা ঠিক নয়। বেশীর ভাগই ভুল ধারণার উপর আলোচনা, মত বিনিময় অনেকেই করে থাকে। সেটা কত বড় অন্যায়।

হিন্দি সিনেমা দেখে আমরা কত আবোল তাবোল শিখি। স্টেশন ক্লাব সত্যি এক একটি সুন্দর, সকলের সঙ্গে সকলের মেলা-মেশা করবার নিরুপদ্রব জায়গা।

খাবার টেবিলে কত রকম গল্প হোল। উড়িষ্যার লোকেদের কথা. এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সব রকমই আলোচনা হোল।

সেদিনের সন্ধ্যেটা খুবই ভাল কেটেছিল সকলের। বিশেষ করে মিঃ ও মিসেস্ রায় ব্রীজ খেলতে পেরে খুবই খুশী হয়েছিলেন।

রাতের কাপড় পরতে পরতে ব্রজেনবাবু বললেন, "আমরা বাঙ্গালীরা এ রকম ছোট ছোট সুন্দর ক্লাব কেন করি না? খুব একটা বিরাট ত কিছুর দরকার নেই। তবে মাসিক চাঁদাও তেমন হবে না। সেখানে গিয়ে সবাই আনন্দ পাওয়া যায়।"

"তা কি হবে কোনদিন? বাঙ্গালীরা ত বাড়ীতে বসে আড্ডা মারতে ভালবাসে, "মায়াদেবী বললেন।

"অনেক, অনেক আগে ত আমাদের এই সিস্টেম্ ছিল। একটু অন্যভাবে। চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা। অবশ্য মেয়েদের জন্য ছিল না। এখন মেয়েরা এসেছে এগিয়ে। তারাও সব কিছুতে অংশ গ্রহণ করতে চায়। তাই বোধহয়, আমাদের কিছু গড়ে উঠতে সময় নিচ্ছে," উর্মি থামল।

সে রাতটা বোধহয়, বিশেষ করে সকলের এক ঘুমে কেটেছিল।

উঠল একটু দেরীতেই সকলে। জানকী সব প্রস্তুত করে, বসে বসে দুপুরের রান্নার কুটনো কোটা নিজের বুদ্ধিতেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। মালীও আর অপেক্ষা না করে বাজারে চলে গেছে গ্যাটের পয়সা নিয়ে। আস্তে আস্তে সবাই এসে খাবার টেবিলে বসল।

"আজকে প্রথম মনে হচ্ছে, আমরা ছুটি উপভোগ করতে এসেছি।"

শম্ভুনাথের কথা শুনে সবাই ওর মুখের দিকে তাকাল।

"ঠিক কথা বলেছেন আপনি, মল্লিক সাহেব। এ ক'দিন যেন কি রকম ছোটাছুটি হচ্ছে। মানে, ঠিক ছুটি ছুটি ভাবটা নেই। যাকে বলে টুরিস্টের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, দেখা।"

"আমি কিন্তু ছোট্ট একটা প্রটেস্ট করে রাখতে চাই উর্মিদেবীর কথায়। আমাদের ট্যুরিস্ট বলা যায় না, আর ঠিক হ,-য-ব-র-লও বলা যায় না।"

"মানে ?"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভাবতেই পারিনি যে মিঃ ও মিসেস্ রায় মনের দিক দিয়ে আমাদের চাইতেও ইয়ং। তাই মনে হচ্ছে চারজন সমবয়সী এসেছি আনন্দ করতে এখানে।"

"ঠিক বলেছেন," বলেই উর্মিলা হাত বাড়িয়ে মল্লিকসাহেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডস্যাক করল।

এতক্ষণে মায়াদেবীর গলা শোনা গেল, "আজকে আমরা সত্যিকারের ছুটির মত কাটাব। চল, চারজনে গিয়ে তিনটি খাট এক সঙ্গে করে জুৎ হয়ে বসে আড্ডা জমান যাক।"

"কি মজা হবে, মা। একটা কথা শুনে রাখ, যাব যখন ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়েও আড্ডা চলবে।"

"আমি কিন্তু প্রথমেই বালিশে হেলান দিয়ে আধ ঘুমন্তভাবে থাকব, আর মিঃ রায়কে শুরুটা করতে হবে গল্পের।"

জানকীকে কফির অর্ডার দিয়ে সবাই গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। জানকীরও মনে হোল দিদিমণির বিয়েটা যদি এখানে হয়। তার সবই মনে মনে ঠিক করে নিল, যাবার সময় মায়াদেবীকে বলে রাখবে, বিয়ে যদি কলকাতাতেও হয়, ওদের যেন যাবার ডাক পড়ে।

জানকী বেচারা ত জানে না, আজকালকার জগৎটা বড় ঘোরালো। জন্মালাম, বড় হলাম, বিয়ে করলাম, মরলাম—সেই সহজ জীবনযাত্রা সকলের জন্য নয়। তাই ত অনেক সময় উর্মিলা ভাবে, ভগবান ভাল বলেই বেশীর ভাগ মানুষকে বিশেষ ধরণের না করে এক ধরণের করেছেন। সাধারণের চাইতে বেশী ভাববার শক্তি তাকে

দেওয়াতেই ত জীবনটাকে সে আর দশজনের মত অনায়াসে নিতে পারে নি। পারলে বোধহয়, খারাপ হোত না।

তখনই মনে হয়, সত্যিই ত, যাদের উনি ভালবাসেন তাদেরই ত একটু চিন্তা করে ভেবে তৈরী করেন। তাই ত তারা হয় আলাদা। সেই সৌভাগ্য যদি তার হয়ে থাকে, তাকে সে নেবে আশীর্বাদের মত মাথায় তুলে।

জুং হয়ে আসন করে বসে ব্রজেনবাবু আরম্ভ করলেন তার ছেলেবেলার কথা :

"জন্মে ছিলাম বাংলাদেশের একটা ছোট্ট শ্যামল গ্রামে। সে দেশ এখন অন্য দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা হয়েছি এখন পশ্চিমবঙ্গের লোক। এখনকার কথা থাক। আমি বলছি পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা।"

হঠাৎ কি ভেবে ব্রজেনবাবু থেমে গেলেন। একমনে সবাই শুনতে তৈরী হয়েছিল। হঠাৎ এ ভাবে থেমে যাওয়াতে উর্মি চোখ খুলে চাইল।

জানিস উর্মি, এক এক সময় মনে হয়, বুঝি সে সব দিনই ছিল ভাল। চট্‌পট্ সবাই বিদায় হয়ে যেত।

আনন্দর সুরটা গেল কেটে।

মা'রও যেন চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠল। উর্মি সরে গিয়ে বাবার গায়ে হাত রাখল, "একজনের অপরাধে সবাইকে তুমি অপরাধী করবে? আমি তোমাদের কত ভালবাসি, তা কি তুমি বোঝ না। ছোটবেলায় একবার অপরাধ করেছিলাম, তা তোমরা প্রাণের থেকে মাপ করে দিয়েছ।

"বুঝি মা, সবই বুঝি। তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, তোর ওপর কি কোন অবিচার হোল?"

"না বাবা। একথা কখনো তোমরা মনে কর না। আমার যখন যা ইচ্ছে হবে তাই আমি করতে পারি। তাতে ত তোমরা বাদ সাধবে

না কোন দিন। দেখ আমার বন্ধু মল্লিকে। ও কি পারছে না সব কিছু করতে? আমি মেয়ে বলে তোমার বারে বারে একথা মনে হয়. আমি বুঝি!”

একটু থেমে সে বলল, “এও বুঝি, আর পঞ্চাশ বছর পরে এই ভাবটা চলে যাবে। তখন যেন তোমরা বেঁচে থাকো, আর আজকের কথাটা ঘুরিয়ে নিতে বলব সেদিন।”

ব্রজেনবাবুর মনে হোল মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতেই শুধু ভাল লাগছে।

মল্লিক, সেটা বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে উঠে, বসবার ঘরে চলে গেল।

মায়াদেবীও সরে এসে ঊর্মির গা ঘেঁসে বসলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ মায়াদেবী উল আর কাঁটা নিয়ে অনেক-দিন পরে বুনতে বসলেন।

“কি ব্যাপার বলত? এক যুগ পরে তোমার হাতে আবার এগুলো। লুকিয়ে বুঝি নিয়ে এসেছিলে সঙ্গে করে?”

“ঠিক বলেছিস্, ঊর্মি। এখানে আসা হবে, অসুখের পরে আমার হাওয়া বদলান দরকার শুনে মনটা যেন হঠাৎ অনেকদিন আগে ফিরে গিয়েছিল। ছোট থাকতে মা-বাবার মুখে একটা কথা শুনেছি। বড় হওয়া অবাধ আর সকলের দিকে তাকিয়ে নিজের এদিকটার কথা ভুলেই গেছিলাম। বড় ভাল লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল, তোর জন্যে নিজের হাতে কিছু বুনি। তাই, সবার অজান্তে বেরিয়ে এগুলো কিনেছিলাম।”

মার দিকে তাকিয়ে ঊর্মির মনে হোল, সে যেন অনেকটা ছোট হয়ে গেছে। মার চেহারাও বদলে গেল। আগের দিনগুলো চোখে ভেসে উঠল। ওরা তিন ভাইবোন সন্ধ্যাবেলা মাঠ থেকে খেলে ফিরে দেখেছে, বাবা বই পড়ে শোনাচ্ছে আর মা বুনছে।

সেটাই আবার কেন জানি তার দেখতে ইচ্ছে করল।

“বাবা তুমি যে কি আপন মনে পড়ছ। জোরে জোরে পড়ে মাকে শোনাও।”

ব্রজেনবাবু হেসে বলেন, "দেখেছ, মায়া, তুমি ওর জন্য ব্লাউজ বুনছ শুনে মনের আনন্দে আমাকে একটা অর্ডার ঝেড়ে দিল।"

মায়াদেবী রাগতভাবে বললেন, "কেন? তোমার কি পড়ে শোনাতে কষ্ট হবে? তবে দরকার নেই।"

মার কথাগুলো উর্মির বড় ভাল লাগল। আগে মা এইভাবেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠত যখন তখন। ইদানীং নানা ঝঞ্ঝাটে মা যেন কেমন শান্ত নির্জীব হয়ে পড়েছিলেন।

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো উর্মি।

"চলুন মল্লিকসাহেব, দু'জনে বারান্দায় বসে গল্প করা যাক্।"

বারান্দার কোণে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বাগানের ফুলের ওপর, গাছের পাতার ওপরও টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন একটা স্বপ্নপুরীর ছোঁয়া চারিদিকে।

শম্ভুনাথকে হঠাৎ কেন জানি, মনে হোল এই স্বপ্নপুরীর রাজকুমার পরক্ষণেই বুঝি উর্মি একটু হেসেই ফেলল। এই চাঁদকে নিয়ে যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ কত স্বপ্ন রচনা করেছে। একে ঘিরে কবিরা লিখেছে কবিতা প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসার এ এক বিশেষ অঙ্গ হয়ে আছে। সেই চাঁদের দেশ থেকে ফিরে এসে যখন বৈজ্ঞানিকরা তার যে বর্ণনা দিলেন, তাতে এতকালের ধ্যান-ধারণা গেল আমূল পরিবর্তন হয়ে। সত্যিই কি গেল? বোধ হয় নয়। এতকাল যা মানুষকে দিয়ে এসেছে আনন্দ, সুখ, তাকি সে ছাড়তে পারে?

যা আবিষ্কার হোল, তা থাকবে বইয়ের পাতায়। জ্ঞানের ভাণ্ডারে তা থাকবে। প্রয়োজনে তা নিয়ে হবে নাড়াচাড়া। সাধারণ লোকের ঘরে মা-ছেলের কপালে চাঁদকে ডেকে বলবেন টিপ দিয়ে যেতে। মিষ্টি-মুখের তুলনা করতে গিয়ে উঠবে সেই চাঁদের কথা। আবার নদীর জলের উপর চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি অশান্ত মনে দেবে শান্তির প্রলেপ।

"কি হলো, উর্মিদেবী?" হাসির শব্দে ফিরে তাকাল শম্ভুনাথ।

"না, তেমন কিছু না। জানেন, কালকে ক্লাবে মিঃ পাত্রর সঙ্গে

অনেক কথা হচ্ছিল। ওর জীবনের কথা শুনে মনে হোল, আমরা মানুষের কতটুকু জানি। আমাদের জানবার পরিধি কত ছোট। অভিজ্ঞতা কত সীমিত তা বাইরে থেকে বোঝা যায় ?”

“উনি যে অরফ্যান। বললেন, ওঁর বাবা সবার অমতে এক গরীব বিধবার একমাত্র সন্তানকে বিয়ে করেন। সবাই তাঁর সঙ্গে সেইজন্য সম্বন্ধ ছিন্ন করেছিল। কয়েক বৎসর তাদের ভালই কেটেছিল। সেই সময় তাঁর দিদিমা মারা যান। তারপর তার জন্মাবার কয়েক মাস আগে বাবা মারা যান। হাসপাতালে জন্ম দিয়ে মা মারা যান। হাসপাতালের বুড়ী দাই, যার কাছে কেটেছে তার শিশুকাল, তার কাছেই শুনেছিলেন তার বাবা-মা-দিদিমার ইতিবৃত্ত। তিনিই কষ্ট করে ভরণপোষণ চালাতেন! একটা স্কুলেও দিয়েছিলেন ভর্তি করে। কপালগুণে তাঁর শেষ আশ্রিতাও চোখ বুঁজল।

ছেলে-মেয়েরা মায়ের ইচ্ছাকৃত বোঝা টেনে চলতে চাইল না। তাদেরও অবস্থা ভাল ছিল না। এটা ঠিক, তাদের জন্যই আজ সে যা, তাই হতে পেরেছে। এক পাদ্রীর কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর সব কথা শুনে কেমন মায়া হয়। তাছাড়া কথা বলে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মাথাটা পরিষ্কার। মিশনারীদের অরফ্যানেজেই সে বড় হয়ে ওঠে, পড়াশুনা সবই তাদের স্কুলে। কলেজে পড়িয়েছে তারা। তারপর এই চাকরী। সেই দাইয়ের ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে এখনো যথেষ্ট সম্পর্ক রেখেছেন। সব রকমে তাদের সাহায্য করেন। মিঃ পাত্রের কল্যাণে তাদেরও অবস্থা এখন মোটের উপর ভাল।”

“আয়ের বেশ একটা মোটা অঙ্ক উনি প্রতি মাসে মিশনে দেন। স্বামী, স্ত্রী, একটা ছেলে, একটা মেয়ে। সুখের এবং শান্তির সংসার।”

“আশ্চর্য! আমি ত কিছু জানতাম না। আগে কলকাতাতে কতবার দেখা হয়েছে। সাধারণত আমরা কত উপর উপর মিশি, তাই মনে হয়।”

“বাইরে ত কত হাসিখুশী ভদ্রলোক, কিন্তু মনের কোণে একটা দুঃখ রয়ে গেছে। জানেন, ডঃ রায়, মা-বাবা কত দুঃখ পেয়েছেন, কত

অভাবের মধ্যে মারা গেছেন। সে কথা মনে হলে মনটা অস্থির হয়ে উঠে—আমি এত ভাল আছি। তাদের কিছু করতে পারিনি। ইচ্ছে করে, যদি শক্তি থাকত তাদের টেনে নিয়ে আসতাম আমার কাছে। আদর যত্নে ভরে দিতাম তাদের।” “সত্যি বড় ভাল ওরা। সংসারে খারাপ লোকের সংখ্যাই অনেক, অনেক বেশী। জানেন মিঃ মল্লিক, কেন জানি, তাদের কথা ভাবতে বা আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না। তাই ত তাদের কথা বাদ দিয়ে শুধু মুষ্টিমেয়র কথা ভাবতে বা আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না। তাই ত তাদের কথা বাদ দিয়ে আমি শুধু মুষ্টিমেয়র কথা বলি ও ভাবি। তাই, আমার বন্ধুরা বলে,—তোর সঙ্গে কথা বললে মনে হয় পৃথিবীর নিরানব্বই ভাগই ভাল, সৎ।”

“এটা আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি। তাইত আপনাকে এত ভাল লাগে মিস্ রায়।” শম্ভুনাথ বলে উঠল।

শেষ কথাটা শুনে হেসে উঠল উর্মিলা, “এখন যা আমার উচিত, মানে উল্টে আপনাকে কম্প্লিমেণ্ট দেওয়া। তা কিন্তু আপনাকে দিতে পারলাম না।”

“মানে ?”

“আপনাকে আমার ভাল লাগে ; কিন্তু এ রকম অনেককেই ভাল লাগে।”

“তা হোক। আমার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। আমারও অনেককে ভাল লাগে ; কিন্তু আপনাকে সব চাইতে বেশী।”

উত্তর দেবার হাত থেকে উর্মি তখনকার মত গেল বেঁচে। জানকী এসে দাঁড়াল খেতে যাবার তাড়া নিয়ে।

তের

দু'দিন পরে ওরা কোণারকে রওনা হোল চার দিনের জন্য। ওখানে টুরিষ্ট বাংলোতে পাত্র বন্দোবস্ত করে দিল। থাকা-খাওয়া। ট্যাক্সি করে ওরা চার জন গিয়ে পৌঁছাল কোণারকে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

খুবই সুন্দর। দুটা ঘর ও দুটা বাথরুম ওদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল। মাত্র একচল্লিশ মাইল।

তা সত্ত্বেও ওরা ঠিক করেছিল যে দিন পৌঁছাবে, সেদিন কিছু করবে না। ওরা ত ঠিক টুরিষ্ট নয়। ওরা ত বেড়াতে এসেছে। চেঞ্জে এসেছে।

"ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবীর শরীর যেন একটু ফেরে সে দিকেই আমাদের সবার আগে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই ত ওখানে তিন দিন থেকে চার দিনের দিন ফিরে আসব ঠিক করলাম। ঠিক করিনি, মিস্ রায় ?"

কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গিয়েছিল উর্মির। তার বাবা-মার জন্য কত ভাবছেন মিঃ মল্লিক।

শুধু বলেছিল, "আমি ত দেখছি আপনি যা করেন, তা নিখুঁত।"

কথাটা শুনে মনে বড় তৃপ্তি পেল মল্লিক। উর্মিলার বাবা-মা বলেই যে এঁদের কথা এত ভাবছে, তা ঠিক নয়। দিনে দিনে এদের ওপর কেমন জানি ওর টান পড়ে যাচ্ছে।

ওখানে গিয়ে উর্মিলা দেখল,—একটা ফ্রেঞ্চ কাপ্‌ল, আর জার্মান পেয়ার হানিমুন করতে এসেছে। আর ইংরেজ দুই বুড়ী।

ওখানে বিকালে পৌঁছে ওরা হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিল। চায়ের সঙ্গে অবশ্য টাও ছিল। মা-বাবা সোজা গিয়ে ঘুম মারল। রাতে খাবার সময় উঠবে।

"আমি নিজের ঘরে গিয়ে একটু পড়ব এখন। কোণারকের বিষয়ে একটা বই নিয়ে এসেছি। কালকে ত আপনাদের উপর বিদ্যে ফলাতে হবে।"

"বাঁচালেন। আমি একটুক্ষণের জন্যও আমার মনের রাজ্যে, মানে ভাবের রাজ্যে যেতে পারব।"

"একথা বললেন ? ঠিক আছে। কাল থেকে কিন্তু আপনার সে রাজ্যে প্রবেশ একেবারে বাতিল করে দেব সারা দিন বকে বকে।"

উর্মিলা এসে বসল বসবার ঘরে। সেই সময়টা টুরিষ্ট বাংলো একেবারে খালি। সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময় নষ্ট করবার সময় কারও নেই। তারাই একমাত্র, যারা বেশী দিন থাকছে এখানে। বেশীর ভাগই আসে একদিন বা দু'দিনের জন্য। ওরা যে আসে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে। জীবনে বোধ হয় তাদের আর এখানে আসা হবে না।

নিজেদের ত তা নয়। এ যে তাদের নিজের দেশ। বাড়ীর কোণে। যখন ইচ্ছে হবে, তখনই আসতে পারবে। তাই ত একবার এক জায়গাতে গেলেই হবে। বিদেশীদের ত সারা ভারতবর্ষ ঘুরে নিতে হবে।

হঠাৎ মনে হোল, বিদেশের এই রীতিটা কি রকম জানি। ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিয়ের পরে হ্যানিমুখে যাওয়া। মানে হয়? কিন্তু? যুগ-যুগান্তর ধরে লোকে বিয়ে করছে। এতে ত কোন বিশেষত্ব নেই। হ্যাঁ, বলা যায়, যারা বিয়ে করছে তাদের কাছে একটা বিরাট কিছু। বেশ ত, তারা সেটা মনে মনে অনুভব করুক। আর দশটা লোককে জানবার কি মানে আছে?

তাছাড়া, আজকাল যেমন তাড়াতাড়ি লাভ ও হয়, তেমনি অলাভ হতে ত খুব বেশী সময় লাগে না। বিশেষ করে বিদেশে। শুধু বিদেশে কেন, এদেশেও হচ্ছে। হতে আরম্ভ করেছে। এটা ত স্বাভাবিক। কান টানলে মাথা আসে।

লাভটা যত দ্রুত হবে, তত দ্রুত আসবে তার সাথী। সত্যিকারের ভালবাসা ত নিমেষে হয় না। সময় নেয়। যেখানে শুধু দৈহিক টানা-পোড়েন নয়, মনের আদান প্রদান, মনের মিল, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ, সেই ভালবাসা হুড়োহুড়ি করে আসে না। আর এলে থেকে যায় সারা জীবনের জন্য।

আগুন আর ঘি যখন এক জায়গায় থাকে, ঠিক সেই রকম, এই বয়সটা বড় সাংঘাতিক। তাই এক এক সময় উর্মিলার মনে হয়, বাবা-মা সম্বন্ধ ঠিক করে বিয়ে দেবার প্রথাটাই বুঝি ছিল ভাল। একটা বয়স না যাওয়া পর্যন্ত বোধ হয় তাই :দরকার। যৌন আবেগ একটু কমলে,

তারপর আসে মনের কথা। সেই বয়সে নিজে জেনে, সময় নিয়ে, অপেক্ষা করে, ভালবেসে বিয়ে করলে……।

নানা ধরনের মোটা সরু গলার আওয়াজ পেয়ে উর্মিলার ভাবনার মোড়টা গেল ঘুরে। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, এক এক করে বেড়িয়ে ফিরছে সকলে। যারা হানিমুন করতে এসেছে, তাদের কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না। তাদের সব কিছুর প্রকাশ যে বাইরে। তুজন তু'জনকে জড়িয়ে ধরে আসছে। তাতেও শুধু হয়নি। মেয়েটা আবার মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছে বরের কাঁধে। সোজা তু'জনে চলে গেল নিজেদের ঘরে।

কেমন যেন হাসি পেল উর্মির। বোধ হয় পাঁচ দশ বছর পরে আবার অন্য কারো কাঁধে মাথা হেলিয়ে যাবে নূতন কোন দেশে হানিমুন্ করতে।

তুই ভদ্র মহিলার দিকে ফিরে তাকাল। ধীরে সুস্থে তু'জনে এসে ঢুকলো। কোণারকের কারুকার্যের কথা আলোচনা করছিল। মনে হোল, এরা সত্যিকারের আনন্দ পেয়েছে। বোধ হয়, কতদিনের আকাজ্ক্ষা ওদের পূর্ণ হল। তুই বন্ধু না আত্মীয়। বন্ধুই হবে। ওদের দেশে বন্ধুর বন্ধনটা বেশ জোরাল। সত্যি, এদের মনের জোর আছে। এই বয়সে বেরিয়ে পড়েছে দেশ ভ্রমণে। ভ্রমণ বলে কথা, একেবারে সাত সাগর পেরিয়ে।

এই বয়সে আমাদের দেশের লোকেদের, বোধ হয় এতটা মনের জোর থাকে না।

ওদের ত মনের জোর করতেই হয়। ওদেশে ত ছেলে-মেয়েরা প্রথম থেকেই ছাড়াছাড়া। সেটাই স্বাভাবিক। তাইতে তারা হয়ে যায় অভ্যস্ত।

"মিস্ রায়, এখন কিন্তু আপনাকে আমাদের মধ্যে পেতে চাই।" মিঃ মল্লিক এসে দাঁড়ালেন।

খুব পড়ছিলেন ত? আমি তখন থেকে ভাবছি মল্লিক সাহেবের কি পড়ার শেষ নেই।"

"সত্যিই।"

"সত্যি কিন্তু নয়।"

"যাক্, বাঁচালেন। না হলে এখনি চিন্তায় পড়তে হতো। আপনার আপন-জন হচ্ছে ভাবনা। তাকে বিদায় দিয়ে....

"ভাল হবে না কিন্তু, মল্লিক সাহেব। আপনি যে এতক্ষণ ঘরের কোনে মুখ গুঁজে পড়ছিলেন, আমি কিছু বলেছি সে জন্য?"

হেসে মল্লিক বলল, "মাপ চাইছি। এখন লক্ষ্মীটির মত দেখুন ত, মায়াদেবী আর ব্রজেনবাবু কি করছেন। খেতে বসা দরকার।"

উর্মিলা উঠে গেল মা-বাবার উদ্দেশে।

পরের দিন পেট ভরে সকলের প্রাতঃরাশ শেষ করে সঙ্গে প্যাক-লাঞ্চ, মানে দুপুরের খাবার নিয়ে চারজনে বেরিয়ে পড়ল সূর্য মন্দির বা ব্ল্যাক-প্যাগোডার উদ্দেশ্যে।

সকলের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এই পৃথিবী-বিখ্যাত মন্দির যা ঘরের কোনায় থাকা সত্ত্বেও এতকাল যে তারা দেখতে আসেনি, এর কোন ক্ষমা নেই।

দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা দেখতে আসে, আর দেশের লোকই দেখবার সময় পায় না। এখানকার বিরাট সূর্যের মূর্তিটা যদিও কষ্টি-পাথরের নয়, তবুও বেশ কালো। যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক ঝড়-ঝাপ্টাতে রং এর হয়েছে বিবর্তন।

শম্ভুনাথ এতক্ষণে মুখ খুলল, "ব্ল্যাক প্যাগোডা নামটি কারা দিয়েছে জানেন?"

"জানি, মশায়, জানি। নাবিকরা। পুরীর শ্বেত মূর্তি থেকে একে আলাদা করবার জন্য," উর্মিলা বলে উঠল।

"আপনি যে এই মন্দিরের কথা আগে ভাগে জেনে রেখেছেন, আগে বলেন নি কেন?"

"কেন? জানলে কালকে বইটা পড়তেন না?"

"যদি বলি, তাই। কিম্বা অতক্ষণ না পড়ে, তার থেকে কিছু সময় কেটে আপনাকে বাঁচাতাম ভাবনার সমুদ্র থেকে।"

"ধরে ফেলেছেন, তবে ঠিক সেই কারণেই বলিনি। আমার যে বড় ইচ্ছে করছিল আবোল তাবোল কিছু ভাবতে।"

"আবোল তাবোল কেন বললেন, উর্মিদেবী?"

"ঠিকই বলেছি, যা শুধু আমি জানব। আর কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানবে না। বলতে পারবে না—এটা ঠিক, ওটা নয়। সে রাজ্যে আমিই রাজা, আমিই প্রজা। আমিই বিচারক, আমিই দোষী। সেটাকে আর কি আখ্যায় ভূষিত করা যায়?"

কথার মোড়টা যেন কেমন সিরিয়াসের দিকে ঘুরে গেল। সেটা শম্ভুনাথের ইচ্ছে নয়।

সকালে উঠেই ওর মনটা ছিল খুশী খুশী। ব্রজেনবাবু ও তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখল, দু'জনে সত্যিই উপভোগ করছে। একদৃষ্টে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে গিয়ে দাঁড়াল উর্মিলার দিকে; "আসুন আজকে শুধু আমরা হালকা হাওয়াতে ভেসে বেড়াই। কেমন যেন তাই ইচ্ছে করছে। এই পরিবেশে আপনাকে মনে হচ্ছে, আপনিও একটি মূর্তি সূর্যদেবের ঘরণী। শিবাই সান্ত্রা, যিনি এই মূর্তি ও মন্দির বানিযেছিলেন তিনিই আপনাকে গড়েছিলেন হাজার বৎসব আগে। বড় যত্নে, বড় আদরে।"

ফিরে তাকাল উর্মিলা শম্ভুনাথের দিকে। চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এ তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আসছে। যেখানে কোন সাংসারিক মলিনতা নেই।

একদিকে মন ভরে গেল আনন্দে, অন্য দিকে দুঃখে। এই পবিত্র ভালবাসার প্রতিদান কি সে দিতে পারবে? তার মন দ্বিধাগ্রস্ত।

সে মনে হয়, এখনো পর্যন্ত সেরকম ভাবে শুধু নিজেকেই ভালবাসে। তখনই মনে হল, সময় যদি আসে কখনও, সে ঠিকই ভালবাসবে। যাকেই হোক, সেখানে থাকবে সত্য; কোন কিছুর জন্য নয়, আবার কোন কিছুর বিনিময়েও নয়।

আসুন, আমরা বাবা-মার কাছে যাই। ওঁরা নিজেদের মনে এগিয়ে চলেছেন।"

দু'জনে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে উর্মিলা বলল, "মিঃ মল্লিক, আমি কোনারকের কথা কোন বইয়ে পড়িনি। চেনা-জানারা দেখে গিয়ে যা বলেছে, তারই থেকে টুকরো টুকরো সংগ্রহ করেই আমার জ্ঞান।"

"ভালই হল। আপনি অকপটে সব কথা বললেন, না হলে..."

"না হলে কি হোত?"

"হোত আর কি। ভেবেছিলাম, যা পড়েছি তা পণ্ডিতি স্টাইলে সবাইকে বলে মাত করে দেব।"

"তা আপনি এখনও পারেন, বিনীতভাবে বললাম। "হাসল উর্মিলা।

ততক্ষণে চারজনে একসঙ্গে জড়ো হয়েছে।

"জানেন ব্রজেনবাবু, রাজা নরসিংহ এটি বানিয়েছিলেন শুধু সূর্যদেবের প্রতি ভক্তির জন্য নয়, নিজের আত্মপ্রশংসার জন্যও বটে," মল্লিক থামল।

"কি রকম? বলত বাবা খোলসা করে। আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে।" মায়াদেবী বললেন।

"কি; মিস রায়, আপনি বলবেন নাকি?"

"বারে। বললাম যে আপনাকে, আমার অবস্থা হচ্ছে সফরী ফরফরায়তে।"

"একথার পরে মনে একটু জোর পাচ্ছি।"

"ওর কথা শুনোনা, ও শুধু তোমাকে চটাচ্ছে," মায়াদেবী হেসে বললেন।

"হাঁ, যা বলছিলাম। অবশ্য এটা বলতেই হবে, পূর্বাঞ্চলের রাজাদের মধ্যে উনি একমাত্র রাজা যিনি মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন। এই কারণে তিনি যদি গর্ব বোধ করেন, তাতে আশ্চর্য কি। তাই এই মন্দিরকে বলা যেতে পারে, একদিকে যেমন ঈশ্বরের মহিমামণ্ডিত, তেমনি অন্যদিকে মানুষের মহনীয়তা।"

তিন জনে মল্লিকের কথা একসঙ্গে শুনছিল। এই অপূর্ব সৃষ্টির কথা জানবার ইচ্ছা কার না হয়।

শম্ভুনাথ তখনও বলে চলেছেন, "এর বিশালত্ব ও সত্যিকারের সৌন্দর্যের, বোধহয়, এই কথাই আমরা পাচ্ছি। কালের নিষ্ঠুর ঝাপটা ছাড়াও সমুদ্রের নৈকট্যও এর ধ্বংসের কারণ।"

মনে হচ্ছিল, সবাই বুঝি ফিরে গেছে সেই যুগে। রাজা নরসিংহ সগৌরবে ফিরে এসেছেন মুসলমান আক্রমণকারীদের হারিয়ে দিয়ে। শুধু পরাজিত করে নয়, তাদেব রাজ্যের দূর সীমানা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে। আনন্দে ফেটে পড়েছে সারা রাজ্য।

রাজা ঘোষণা করলেন—এই ঘটনা যেন চিরকালের মত মানুষের মনে থাকে। তাই পৃথিবীর মধ্যে সেরা মন্দির স্থাপন করতে হবে যার স্থাপত্যকীর্তি যুগ যুগ ধরে প্রেরণা যোগাবে মানুষের মনে।

পৃথিবী বিখ্যাত স্থপতি শিবাই সান্ত্রার ডাক পড়ল।' তিনি মাথা পেতে রাজার আদেশ গ্রহণ করলেন,—"তাই হবে মহারাজ।"

কাজ শুরু করে, পড়লেন মহা ফাঁপড়ে।

উর্মিলা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, "মল্লিক সাহেব, এখন থেকে শুরু হল আপনার বানানো উপকথা, কি বলেন?"

"আমার বানানো একটুও নয়। কোন কিছু মন থেকে সুন্দর করে বলার বা লেখার ক্ষমতা নেই। একটাও যদি থাকত, তবে আমি হতে পারতাম নামী লেখক বা বক্তা। যা বলছি সবই বইয়ের পাতা থেকে কুড়িয়ে সত্যি।"

"সত্যি? তবে বলুন।"

"বলবে আর কি করে, শম্ভুনাথ? দিলি ত বলা শোনার মুড, আর ছুটোই নষ্ট করে।"

মনে হল ব্রজেনবাবু যেন একটু ক্ষুব্ধই হয়েছেন। উর্মিরও মনে হল, এরকম ছেলেমানুষীটা তার না করলেই ভাল হতো।

মিঃ মল্লিক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "না, না। বলতে বাধা কিছুই পড়েনি. আপনাদের যখন শোনার আগ্রহ আছে। হাজার দু হাজার কর্মী নিয়ে ত উনি শুরু করলেন কাজ। কিন্তু এমনি কপাল, মাটি নরম হওয়াতে কাজ কিছুতেই এগুতে পারছিল না। যাই হোক্,

একদিন মন মরা হয়ে সমুদ্রের ধারে বালুর ওপরে ঘুমিয়ে পড়েন। খিদের চোটে ঘুম ভেঙ্গে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন একটা বৃদ্ধা তার কাছে এক থালা ভাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। খিদের ঝোঁকে তাড়াতাড়ি তিনি ধূমায়িত ভাতের মাঝখানে আঙ্গুল ঢুকাতেই তাতে ফোস্কা পড়ে।

"বৃদ্ধা ধমক দিয়ে তাঁকে বলে,—"বাছা, তোমার খাবার ঢং হচ্ছে ঠিক শিবাই সান্ত্রার মন্দির বানাবার মত। খাওয়া আরম্ভ করতে হয় পাশ থেকে, মাঝখান থেকে নয়। শিবাই সান্ত্রা ত মাঝখানে কাজ করাবার চেষ্টা করছে।"

—বৃদ্ধার কথাতে স্থপতির চোখ খুলে গেল। নূতন করে তিনি আরম্ভ করলেন।"

"বড় ভাল লাগল তোমার মুখে সব শুনে," ব্রজেনবাবু বলে উঠলেন।

"এখন বুঝতে পারছি, কেন তিনি সূর্যদেবকে বসিয়েছেন তাঁর নিজের রথের উপরে," উর্মিলা বলে উঠল।

"ঠিকই ধরেছেন আপনি। রথের চব্বিশটা বিরাট চাকা টানছে সাতটা শক্তিশালী অশ্ব।"

সবাই গিয়ে দাঁড়াল ভগ্নাবশেষ একটা চাকার কাছে।

"একি! মল্লিক সাহেব চুপ করে গেলেন যে? আরো কিছু বলুন। না হলে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞের উপাধি কি করে আপনাকে দিই, বলুন ত?"

"মাথায় থাক আপনার দেওয়া সম্মান। গলা শুকিয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক ত ঘোরা হল। আমার যখন খিদে পেয়েছে, তখন সকলের নিশ্চয়ই একই অবস্থা।"

মায়াদেবীর ইচ্ছে হল বলেন, এমন মন মজানো কাহিনীর মাঝখানে না থামিয়ে খিদে একটু চেপে থাকলে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ছেলেমানুষদের খিদে পেয়েছে বলে মনের কথা মনেই চেপে গেলেন। তাকিয়ে দেখলেন, দু'জনে পা চালিয়ে গিয়ে খাবার ও জল, সব নিয়ে এসে সুন্দর একটা জায়গাতে রেখেছে।

স্বামীকে প্রসন্ন মনে সেদিকে এগুতে দেখে বুঝলেন, খিদে ও তৃষ্ণা, দুটোই পেয়েছে তার। আস্তে আস্তে নিজেও সেদিকে গেলেন এগিয়ে। গোল হয়ে বসে নিঃশব্দে সবাই খাচ্ছিল। বেশ বোঝা গেল সকলেরই পেট খালি হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়ার শেষে সবকিছু গুছিয়ে রাখতে রাখতে উর্মি বলে উঠল, "আপনি বড় সুন্দর করে বলেন, মিঃ মল্লিক। ভাগ্যিস্ আপনার সঙ্গে আসা হয়েছিল। তাইত সবকিছু চোখের সামনে প্রাণাস্ত হয়ে উঠ্ছে। বলতে ইচ্ছে করছে, ভবিষ্যতে এরকম জায়গাতে গেলে আপনাকে সঙ্গে থাকতে হবে।"

"অশেষ ধন্যবাদ, মিস রায়। এতবড় পুরস্কার পাব তা মোটেই আশা করিনি।"

"সবাই উঠে পড়ে আবার ঘুরে ঘুরে দেখতে আরম্ভ করল। এই যে সাতটা ঘোড়া দেখছেন, এরা হচ্ছে এক সপ্তাহের সাত দিনের প্রতীক। একইভাবে চব্বিশটা চাকা হচ্ছে বছরের চব্বিশটা পক্ষ। এক একটা চাকার আটটা পাখি বা তার একদিনের আট প্রহরের প্রতীক। এই আট প্রহরকে সে কালো রাত আর দিনে ভাগ করা হতো।

ব্রজেনবাবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"এ সব দেখলে মনে কি হয় জান, মানুষ ক্ষণভঙ্গুর বলেই বোধ হয় তার বড় আশা, তাকে যুগ-যুগান্তর ধরে সবাই মনে রাখুক।"

ঠিকই বলেছ, বাবা। মানুষের মনের এই বাসনার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বাঁচতে চায়। সাধারণ মানুষ বাঁচতে চায় তার সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়ে। অসাধারণরা বাঁচতে চায় তাদের কীর্তির মধ্যে দিয়ে। কখনও ভেবে দেখে না সবই অনিত্য। কোন কিছুরই দাম নেই "

মিঃ মল্লিক হেসে বললেন, "আমার কি মনে হয় জানেন; মিস্ রায়? সৃষ্টিকর্তা চায় তার সৃষ্টি চলুক অনন্তকাল ধরে। তাই মানুষের মনেতে এই আকাজ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছেন। না হলে যে তার সৃষ্টির হতো অবসান।"

"বড় ঠিক কথা বলেছেন আপনি। তাই এক এক সময় ইচ্ছে হয় দুই তাকে দু'কথা শুনিয়ে। তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এটা বানাতে। আর মনের খেয়ালে যদি বনিয়েইছ, তেমনিভাবে যেতে দাওনা একে শেষ হতে।"

ঊর্মিলা উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অনন্ত আকাশের দিকে। কি যেন পড়তে চেষ্টা করছে। কি লেখা আছে সেখানে, এই পৃথিবীর জন্ম পত্রিকাতে।

চৌদ্দ

শম্ভুনাথ সামনের দিকে চেয়ে দেখল মায়াদেবী ও ব্রজেনবাবু অনেক ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছেন সূর্যদেবের মূর্তির পায়ের কাছে।

সেদিনের শেষবারের মত সূর্যদেব নিজের মূর্তিটিকে দেখে ঢলে পড়েছেন পশ্চিমের কোলে।

যারা দেখতে এসেছিল, তারাও অনেকে চলে গেছে।

সে গিয়ে দাঁড়াল ঊর্মিলার কাছে, মিস্ রায়, চলুন হোটেলে ফেরা যাক। আপনার বাবা-মার বেশ ঘোরা হয়েছে। দূর থেকে দেখে ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।"

ঊর্মিলা ডুবে গিয়েছিল তার নিজস্ব ভাবের রাজ্যে। মল্লিকের ডাকে সে ফিরে তাকাল, "সত্যি ত সন্ধ্যে হয়েছে। চলুন, ওঠা যাক্।"

গাড়ীতে যেতে যেতে ব্রজেনবাবু বললেন, "কাল ত আবার আমরা এখানে আসছি?"

হ্যাঁ বাবা। কালকে আবার আমরা এখানে আসছি। আজকে ত ওপর ওপর দেখা হল। কালকে আর একটু ভালভাবে দেখা যাবে।"

"কি যে অপূর্ব তোমরা সব দেখাচ্ছ। মনে হচ্ছে, এজীবনে না দেখে গেলে একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত।"

মায়াদেবীর কথাতে মনে হল, অন্তর থেকে কথাটা বেরিয়ে

এলো। জীবনে অনেক ঝাপটার পরে যেন শান্তির অভাস পাচ্ছেন এতদিনে।

ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। ঊর্মিলার যদিও ইচ্ছে করছিল বসবার ঘরে বসে দু'একজনের সঙ্গে আলাপ করে, কিন্তু তার মনে হল সে গিয়ে না শুলে, বোধ হয়, মা-বাবা ঘুমোতে পারবে না।

পরের দিন দেরীতে সবার ঘুম ভাঙ্গল। তাড়াহুড়ো করে তৈরী হয়ে ওরা যখন খাবার ঘরে এসে ঢুকল, বেশীর ভাগই তখন প্রাতরাশ শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শম্ভুনাথ ওদের অভ্যর্থনা করল, "শুভ প্রভাত। ভাববেন না আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। মিনিট পাঁচেক বোধহয় আমি এসেছি।"

"আপনার শিবাই সান্ত্রার চোখের ঘুম মনে হয় আমাদের সকলের চোখে এসে বাসা বেঁধেছিল। কি যে সবাই মিলে ঘুমোন হয়েছে।"

খেতে খেতে মল্লিক বলল, "আপনার কথটা কিন্তু ঠিক মত বলা হল না। শিবাই সান্ত্রা আমাদের সকলের উপর ভর করেছিল।"

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠল।

"দেখেছিস ঊর্মি, আমাদের মল্লিক কি সুন্দর কথা বলতে পারে," সস্নেহে ব্রজেনবাবু বললেন।

কথার ভাবটা হঠাৎ কেন জানি শম্ভুনাথকে ওদের কাছে টেনে নিল। শম্ভুনাথের মনের মধ্যে কেমন জানি হল, সত্যি কি ওর ভাগ্যে তা হবে ? ওদের কাছে সত্যিকার যাওয়া ?

আগের দিনের মত সঙ্গে খাবার নিয়ে কোণারকের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। ওখানে ঘুরতে ঘুরতে মল্লিক বলল, "জানেন, অনেকে বলে কোণারক যদি উনিশশো দুই খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অযত্নে পড়ে না থাকত, তবে বোধহয় তাজমহলের স্থান নিত। এইভাবে অবহেলিত না হলে, পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্যের একটা হতো কোণারক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"ঠিকই বলেছ হে শম্ভুনাথ। মানুষের মূর্তি এত সূক্ষ্মভাবে পাথরের উপর তৈরী, তা কি কোথাও দেখা যায়? এক একটার মধ্যে এমন জীবন্ত কোমল ভাব এনে দিয়েছে, ভুলে যেতে হয় এ মূর্তি পাথরে গড়া।"

সূর্যদেবের তিনটি মূর্তি এমনভাবে এমন য়্যাংগেলে আছে, তিনবার দিনে তা ঝল্‌সে ওঠে সত্যিকারের সূর্যের কিরণে। ভোরে যখন সূর্য ওঠে, দুপুরে যখন ঠিক মাথার উপরে যায়, আবার যখন সন্ধ্যেবেলা অস্ত যায়। অবশ্য মূর্তিগুলো ব্রোঞ্জ-এর তৈরী।"

"ঠিকই বলেছিস্, মা।"

মল্লিককে আজ কথায় পেয়েছে। সবাইকে থামিয়ে সে বলে চলল, "এখানে পৃথিবীর সব কিছুই আছে। যিনি বানিয়েছিলেন, তাঁর মনের মধ্যে ছিল সারা পৃথিবীর প্রতিটা জিনিস, বড়-ছোট, সুন্দর অসুন্দর। মানুষের মনের সুরুচি ও কুরুচি, কোন কিছুই তিনি বাদ দেননি। এমনভাবে করেছেন যেন ভগবানের সৃষ্টিতে মলিনতা কোন কিছুতেই নেই। কলঙ্ক হচ্ছে মানুষের দৃষ্টিতে। খোলা মনে, সাদা চোখে দেখলে অসুন্দর হয়ে ওঠে সুন্দর, অপবিত্র হয়ে যায় পবিত্র।"

"কি সুন্দরভাবে বললেন আপনি। আমারও তাই মনে হচ্ছিল। মানুষের দৃষ্টি, মানুষের চিন্তা একই জিনিসকে করে স্বর্গীয়, আবার নারকীয়।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত মিঃ ও মিসেস্ রায় ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। সেদিন ওদের ঘোরাটা প্রথমদিনের মত হয়নি। বেশ আয়েসেই সকলে দেখছিল। সময় নিয়ে সবাই মধ্য-ভোজন শেষ করল। মাঝে মাঝে হাল্কা কথাবার্তাও হল বেশ।

আগে ভাগেই সেদিন ওরা হল হোটেল মুখো। ফিরে এসে আরাম করে বারান্দায় বসে দ্বিতীয় চায়ের পর্বও হল।

একালে, এতদিন একসঙ্গে বড় একটা কেউ আসে না। তাই বোধ হয়, ওখানকার কর্মচারীরা এদের একটু বেশীই খাতির যত্ন করছিল।

ঠিক হল, পরের দিন ওরা দুপুরের খাওয়া খেয়ে ভুবনেশ্বরে ফিরে

যাবে। রাতের খাবার কথা জানকীকে বলে এসেছে। কোন ভাবনা নেই। মায়াদেবী ভাবছিলেন, এ রকম হাওয়ার ওপর যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত, বেশ হতো। এখানে এসে ছেলেদের কথা বড় একটা মনে পড়ছে না। মনটা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা বোধ করছেন। বেশ বুঝতে পারছেন, হাওয়া বদলিয়ে তিনি যেন নূতন জীবন পেয়েছেন!

বেশ হয়, উর্মির যদি শম্ভুনাথকে মনে ধরে। কোন আভাস উনি দেবেন না। যা মেয়ে, তাদের মনের কথা জানলে নিজের কথা না ভেবেই হয়ত করে ফেলবে মনস্থির। উনি তা চান না।

রাতের খাবার পর উর্মিরও একটা গান শুনল সবাই। পরের দিনের আবহাওয়াটা বড় মন্থর, বড় মৃদু। ধীরে সুস্থে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সবাই বসল ব্রজেনবাবুদের শোবার ঘরে বিছানার উপর।

"আপনার সেদিনের গল্প কিন্তু মাঝ পথে থেমে গিয়েছিল।" বলেছিল মল্লিক।

"ঠিক বলেছ সে দিন যা বলেছিলাম।"

"না, থাক বাবা, তোমার গল্প; আমি বরঞ্চ একটা গল্প বলি।"

"বেশ, তাই বল।"

"শোন তবে; এক ছিল রাজকুমারী। সবারই আদরের পাত্রী। সে হাসলে মুক্তো ঝরে। পান্না হীরে দিয়ে যেন তৈরী। পটল চেরা চোখও নয়, বাঁশীর মত নাকও নয়, গোলাপের মত গায়ের রংও নয় তবুও সবাই তাকে চায়। সবার তাকে ভাল লাগে। মন কিন্তু সে স্থির করতে পারে না, কিংবা বলা যায়, চায়না স্থির করতে। সংসারের সুখ-দুঃখে তার মন গেছে পাল্‌টে। তার মনে হয় সে বেশ আছে। তার ইচ্ছে করে না কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়তে। ভগবান যতটুকু জড়িয়ে দিয়েছে, তার চাইতে বেশী কিছুতে সে আর যেতে চায় না। সে জানে, মানুষ যে বোঝা সখ করে টেনে নেয়, তা আর নামে না। বেড়েই চলে।"

কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে উর্মিলা ভাল করে তাকিয়ে দেখল,

একদিকে বাবা কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে মাও প্রায় তাই, আর শম্ভুনাথ নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছে তার কথা।

"এই যাঃ, যাদের গল্প শোনার কথা, তারা ত ঘুমিয়ে অসাড়।"

"হবারই কথা। আপনার সুরেলা গলায় রাজকুমারীর গল্প শুধু ছোটদেরই চোখে ঘুম আনে না, বড়দেরও আনে।"

"মল্লিকসাহেব কোন দলে?"

"আমারও এই দু'দলের একদলে পড়বার কথা। শুধু একটা কারণে পড়তে পারিনি। এই রাজকুমারীটি কে, তার উত্তর এখনও মেলেনি।"

একটু হেসে উর্মি বলল, "মেলেনি ত? মিলবেও না। একটা কথা আছে না, সাধারণ মেয়েদের বিষয়েও দেবা না জানন্তি, কুতো মানবাঃ? আর এ ত রাজকুমারী।"

শম্ভুনাথ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বলল, "তা ঠিক। একটু বোধ হয় দুঃসাহস হয়ে যাচ্ছিল।"

"বাবা-মা ঘুমোচ্ছেন। চলুন, আমরা পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ি।

"কোথায়?" মিঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করল।

"কোথাও না। দুপুরের খাবার আগে কাছে পিঠে একটু ঘুরে নেওয়া যাক্।"

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নামল রাস্তায়।

"আজই ছেড়ে যেতে হবে এই জায়গা, এই পরিবেশ। ক'দিনই বা এখানে আছি। কেমন এক মায়া বোধ করছি। কে জানে, অতীতের অনেক জন্মের একটা জন্ম বোধ হয়, এখানে হয়েছিল।"

শম্ভুনাথ কোন কিছু না বলে ওর পাশে পাশে হাঁটছিল। বড় ভাল লাগছিল উর্মির স্বর, কথা বলার রকম। ও যা বলে, তা অলীক। হলেও আসে বাস্তবতার ছায়া।

"আরও একটা কথা মনে আসে মল্লিকসাহেব, আমি নিশ্চয়ই অনেক যুগ ধরে এই পৃথিবীতে আসা যাওয়া করছি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রূপে। তাই বোধ হয়, যেখানেই যাই না কেন, একটা নাড়ীর টান বোধ করি। না হলে কেন এমন হবে বলুন?"

"হতে পারে। আমরা জন্মজন্মান্তর মানি, তাই এ হওয়াটা আশ্চর্য নয়। যারা জাতিস্মর হন্, তাদের মনে থাকে সব কিছু। সর্বসাধারণের ছিটে ফোঁটা ছাপও মনে থাকে না, আগের জন্মের। আপনি বোধ হয় মাঝখানে। আরও একটা কথা আছে, উর্মিদেবী। আপনি ভাবুক, ভাবনার মধ্যে আপনি অনেক কিছু পান, অনেক কিছু উপলব্ধি করেন।"

"শেষের কথাটাই বোধ হয় ঠিক শম্ভুনাথবাবু।"

"আমার ঘড়িতে যে বারটা বাজল, আপনার?"

"আমারও তাই।"

"তবে এখন আর দেরী না করে খেতে বসা দরকার। খাবার পরে ওঁদের আধ ঘণ্টা বিশ্রামের দরকার।"

"যাই, ওদের ডেকে নিয়ে আসি," উর্মিলা চলে গেল।

একটা কথা বারে বারে শম্ভুনাথের মনে আসছিল, এই ক'দিনের ঘনিষ্ঠতাতে ওর মঙ্গল হচ্ছে? না, অমঙ্গল? উর্মিলাকে প্রথম দেখাতেই ভাল লেগেছিল। তা হয়ে গেল কত বছর। বারে বারে দেখা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ফাঁকও ছিল। কখনও অনেকখানি, কখনও ছোট। বেশীর ভাগই দেখা হতো ইন্দ্রজিতদের ওখানে।

দেখা হবার দিন সকাল থেকে মনটা হয়ে উঠত চন্‌মনে। বেশ বুঝতে পারত, উর্মিকে দেখবার তাগিদ বোধ করছে। দেখা হবার পরের দিনটা কোন কিছু ভাল লাগত না। আবার সয়ে যেত। গতানুগতিক ভাবে ভালই কাটত দিনগুলো। অনেকবার চেষ্টা করেছে উর্মির সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট করতে। শুধু এক কথা—নাই যে সময়, নাই, নাই।

তারপর মাঝে মাঝে তার বাইরে যাওয়া আরম্ভ হল। গেলে মাস দু'-তিনের জন্য। চিঠি লেখা বারণ, উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সেই এক কথা, সময়ের অভাব। হঠাৎ এক সঙ্গে কলকাতায় বেড়াবার সুযোগ এসে গেল। তার পরই ভুবনেশ্বর।

"দেখুন, দু'জনকে তাড়া দিয়ে নিয়ে এসেছি। এখন আপনিও চটপট্ চলুন।"

"উঃ! ঊর্মিলাটা কি! এমন তাড়া দিল যেন ট্রেন ছেড়ে দিল," হেসে ব্রজেনবাবু বললেন।

সবাই গিয়ে বসল খাবার ঘরে।

"এখানকার দিনগুলো কি সুন্দর যে কাটলো।"

"এ কথা কেন বললেন মা? ভুবনেশ্বরে কি ভাল কাটেনি? আমার শুধু মনে হয়, এতে মাটি ব্যথা পায়। মনে হয়, সবেতে প্রাণ আছে।"

"অত আমি বুঝি না। তবে সত্যি কথা বলব, তোদের দু'জনের কল্যাণে প্রত্যেকটা দিনই ভাল কাটছে, সব জায়গায়ই সুন্দর, মায়াদেবী খুশী মনে বললেন।

বিশ্রামের পরে সবাই চেপে বসল ট্যাক্‌সীতে ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে। মোটরে যেতে যেতে কারো মুখে কোন কথা নেই। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট গ্রামগুলো ছবির মত। পর্ণকুটীরগুলো সাদা মাটি দিয়ে লেপা। সবুজের মাঝখানে সাদা রং এর ছোপ। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। তাছাড়া রয়েছে ছোট ছোট জলাশয়। পাতিহাঁস তাতে খেলে বেড়াচ্ছে। কোনটাতে আবার রয়েছে নীল রং-এর কুমুদ ফুল ফুটে। মন জুড়িয়ে গেল। তাই বুঝি সকলের মুখের কথা গিয়েছিল বন্ধ হয়ে। দু'চোখ ভরে সবাই এই সুন্দর প্রকৃতিকে দেখছিল। মানুষের হাতের ছোঁয়া লাগেনি বলেই বুঝি মন ভরে যায়।

ভুবনেশ্বরে পৌঁছে বাড়ীতে ঢুকে প্রথম কথা উচ্চারিত হল মিঃ রায়ের মুখ থেকে,—"জানকী, চা দাও।"

"বাবা, এতক্ষণ পরে তোমার কথাতে আমাকে মনে করিয়ে দিল একটা বড় গভীর কথা। ঈশ্বরের প্রথম বাণী—'আলো, আরো আলো।"

"কিসের থেকে কি কথা যে বলিস্ তুই?"

"কেন? কি অধিকটা বললাম, বল? আলো আমরা সবাই পেয়ে গেছি। তা আবার চাইবার কোন মানে হয় না। তুমি চাইলে চা, যা আমাদের সকলের প্রয়োজন, কিন্তু পাইনি। এমন দিন ত আসতে পারে, চা-এর তৃষ্ণা নিয়ে শূন্যে হাত বাড়ালেই ধূমায়িত এক কাপ চা শূন্য থেকে হাতে আসবে।"

"মিস্ রায়-এর চায়ের বিশেষ প্রয়োজন, বোঝাই যাচ্ছে। তাই এলোমেলো বকতে আরম্ভ করেছেন," মল্লিক মন্তব্য করল।
জানকী ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে কথাটা শুনে মুচকি হেসে প্রথম কাপটা এগিয়ে দিল উর্মিলার দিকে।

গুম্ হয়ে বসল উর্মি, দেখলে মা, আমি কেমন সুন্দর করে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম; আর সবাই কিনা এমন করে আমার পিছনে লাগল।"

"সত্যিই ত। সবাইকে এত আনন্দ দেয় মেয়েটা, আর তোমরা কিনা ওর পিছনে লাগছ," আর একটি নিজে নিয়ে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দু'জনে কাপে চুমুক দিল।

ব্রজেনবাবুর ততক্ষণে মনটা খারাপ হয়ে গেছে—মেয়েটার মনে কষ্ট দিলেন। সন্তানদের মধ্যে ঐত তাঁদের এত ভালবাসে। কাছে সরে এসে পিঠে হাত রাখলেন, "চটলি উর্মি, আমার ওপর?"

উর্মিলা বাবার ব্যথিত মুখটার দিকে তাকিয়ে হৈ হৈ করে হেসে উঠল, "আমি তোমাদের উপর কখনও চটতে পারি? চটিনি মোটেই। কিন্তু কেমন জব্দ করলাম তোমাকে?"

ব্রজেনবাবুও দিলেন মেয়ের পিঠ চাপড়ে, "সাবাস বেটী, এই ত চাই। একেই ত বলে বুদ্ধির খেলা।"

শম্ভুনাথ চুপচাপ চা খেতে খেতে ভাবছিল—এই তিনজনের মধ্যে ও যদি চতুর্থ হতে পারে, তবে যে সে সব পেয়ে যাবে। তা কি কোন দিন হবে?

তারপর দিন পাত্র, মিসেস্ পাত্র এসে হাজির হল। ওদের ইচ্ছা, ওদের চারজনের সঙ্গে ওরা দু'জনও যাবে পুরী।

"আপনারা সঙ্গে থাকলে ত খুব ভাল হবে। কিন্তু আপনাদের ছেলে ও মেয়ে?

"মায়াদেবী, সেদিন একটু কষ্ট হবে আপনাদের। আমরা সবাই রওনা হব খুব ভোরে। চল্লিশ মাইল ত মাত্র। সারাদিন একসঙ্গে পুরীতে কাটিয়ে আমরা দু'জনে রাত্রে ফিরে আসব ভুবনেশ্বরে। বিশ্বাসী

আয়া আছে। আপনারা ফিরবেন আপনাদের খুশী মত," মিঃ পাত্র বললেন।

তিন দিনের দিন পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত অনেক আলাপ আলোচনার পরে স্থির হল।

"এই দু'দিনের মধ্যে একদিন আসুন আবার ক্লাবে। মজা করে তাস খেলা যাবে।"

মিসেস্ পাত্রের কথায় সবাই সায় দিল।

এবার মায়াদেবী বলে উঠলেন, "কালকে দুপুরের ও রাতের নেমন্তন্ন রইল আপনাদের। তার সঙ্গে তাস ত চলবেই।"

"বাকি দু'জন কি করবে ?" মিঃ পাত্র বলে উঠলেন।

"বাকি দু'জনের চিন্তা ওদের ওপর ছেড়ে দিন। আমার কি ভয় হচ্ছে জানেন ? শেষে চারজন না এসে দু'জনের গ্রুপে হাজির হয়।"

পনের

শম্ভুনাথের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। সভা ভঙ্গের পর পাত্ররা চলে গেল। সকালে উঠে মায়াদেবী ও উর্মিলা জানকীর সঙ্গে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। ব্রজেনবাবু ও শম্ভুনাথ মালীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল বাজারে। দুপুর ও রাতের রান্না সকালেই সেরে ফেলবার ইচ্ছে। ফ্রিজ আছে। কাজেই কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া, জানকীও রাঁধে ভাল। বাকিগুলো ও একাই সামলাতে পারবে।

উর্মিলা বলল, "নিজেদের বাড়ী নয়। অত গোছগাছের কোন দরকার নেই।"

"তা যা বলেছিস্। জানিস্ উর্মি, এক এক সময় মনে হয়, যদি নিজেদের একটা বাড়ী করতে পারতাম। তোর বাবার বড় সখ ছিল।"

খুন্তি নাড়তে নাড়তে উর্মিলা ফিরে চাইল মার দিকে, "হবে না ভাবছ কেন ?"

"তোর দাদা বাড়ী করেছে লণ্ডনে। তার মধ্যে আমরা কোথায়? অনুপও করবে জানি, আমরা তখন ওপারে।"

"তুমি কি করে জান্‌লে, আমি শিগ্‌গিরি তোমাদের বাড়ী করে দেব না, ছোট হলেও তা হবে তোমাদের নিজস্ব।"

"তুই ত সবই করিস মা। কিন্তু বাড়ী? সে যে অনেক খরচের ব্যাপার।"

উর্মিলার আর উত্তর দেওয়া হল না। বাজার নিয়ে সবাই এসে গেছে। হুড়োহুড়ি করে সবাই হাত লাগাল। উর্মির কিন্তু মনের মধ্যে মার কথাটা ঘুরতে লাগল। এমন করে ত আগে কোনদিন মা বলেনি। তবে কি?

দুপুরে খাবার পরে ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবী গেলেন আধঘন্টা বিশ্রাম নিতে। তখন বাকি চারজনে বসে পুরীর কথা হল। ব্যবস্থা সব করবে পাত্র। সেদিক দিয়ে কারও কোন ভাবনা নেই। সবাই একটা মোটরেই চলে যাবে, সেটাই ঠিক হল।

ব্রজেনবাবুর গলা শোনা গেল, "এই যে, আমরা এসে গেছি, মিঃ পাত্র। মিসেস্ পাত্র আমরা দু'জনে জিতব ঠিক করে রাখুন।"

তাসের প্যাকেট পাত্ররাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। চারজনে হৈ, চৈ করে তাস খেলা আরম্ভ করল। উর্মি গিয়ে ছ'কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এলো। ব্রিজাইটরা মশগুল। ওদের কাছে কফি রেখে উর্মি ও শম্ভুনাথ কফির কাপ হাতে বারান্দাতে গিয়ে বসল।

"এখানে বসতে আমার খুব ভাল লাগে। আচ্ছা, মল্লিকসাহেব, ফুস্-মন্তরে এই বারান্দাটা কলকাতায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না?"

"বারান্দাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন? বাগানটা?"

"না, না। আমার দরকার নেই বাগান ছাড়া বারান্দার।"

"আমি সাধারণ মানুষ, আশাটাও তেমনি সাধারণ। শুধু বারান্দাতেই আমি সন্তুষ্ট। তাতে থাকবে কয়েক খানা বেতের চেয়ার। তাতে বসব আমরা। যেমন বসে আছি। রাস্তার টুকরো টুকরো দৃশ্য চোখে পড়বে।"

"মল্লিক সাহেব, এ আর বেশী কি ? কলকাতার কোন বারান্দায় মাঝে মাঝে বসলেই হবে," উর্মিলা ফিক্ করে হেসে ফেলল।

"আপনাদের ফ্ল্যাটে ?"

"আমাদের ছোট ফ্ল্যাটে ছাই বারান্দাই নেই বলতে গেলে। পেছনে এক ফালি আছে কাপড় শুকোতে দেবার জন্য। সেখান থেকে রাস্তার টুকরো টুকরো দৃশ্য চোখে পড়া একেবারেই অসম্ভব।"

"তবেই দেখুন উর্মিদেবী, আমরা সাধারণ আকাঙ্ক্ষা বলে যেটা উড়িয়ে দিচ্ছি, সেটা ঠিক তেমন সহজ নয়।"

"আপনার ফ্ল্যাটে ত শুনেছি বারান্দা আছে।"

"তা আছে। কিন্তু সেখানে ত দেবীর পদার্পণ হয়নি কোন দিন। পুণ্যস্থান না হলে ত দেবীদের যাওয়া সম্ভব নয়।"

একটু হেসে উর্মিলা বলল, "সে সব দিন-কাল চলে গেছে। দেবীর আগমন ছিল তখন আবির্ভাব। বাড়ীর মেয়েরা স্নান করে, না খেয়ে, পবিত্র মনে দেবী বরণ করে নিতেন। তার আগে থেকে কত কিছু ব্যবস্থা। নিয়মের এদিক-সেদিক যেন না হয়। বাড়ীর ছেলেরা শুচি স্নিগ্ধ মনে, স্নান করে, খালি পায়ে এসে দাঁড়াত। তখন মনে হোত মৃন্ময়ীদেবী চিন্ময়ী হয়ে উঠেছেন। জীবন্তদেবী বরাভয় হাতে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে। ছোট বেলায় দেখেছি সত্যিই সকলে বিশ্বাস করত, মনের কথা দেবী জানতে পারেন। তাই কু-চিন্তা মনে নিয়ে সেখানে ঢুকলে অকল্যাণ হবে আর এখন মানবীর চাইতেও দেবীর অবস্থা শোচনীয়। যেখানে সেখানে তাকে বসান হচ্ছে। খুশীমত মাইক চালিয়ে দেবীর কানে তালা লাগাবার জোগাড়। আজকাল তাই দেবী ত আসেন না। তাই—তা হয়ে যায় মাটির পুতুল।"

"খুব ঠিক কথা বলেছেন, ডঃ রায়। আমি সর্বান্তকরণে একমত।"

একটু থেমে শম্ভুনাথ বলল, "আমার কথার জবাবটা কিন্তু—এখনও পাইনি।"

"মানবীরা ত দেবীদের মত অত সাদাসিধে নয়। আপনি কি তেমন ভাবে যেতে বলেছেন কোন দিন ?"

"এই অভিযোগটা কি ঠিক?"

"না, একেবারেই ঠিক নয়," হেসে ফেলল উর্মি।

"জানেন ত, খেটে খাওয়া মানুষ। ইচ্ছে থাকলেও কাজের বাহিরে কিছু করা সম্ভব হয় না।"

চুপচাপ থেকে শম্ভুনাথ বলল, "পরের জন্মে যেন মল্লিকাদেবী বা ইন্দ্রজিতের জায়গাটা নিতে পারি,"

"না, মল্লিকসাহেবের সঙ্গে পারব না। ঘাট মানলাম। এবার গিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফ্ল্যাটের বারান্দাতে বসে এই ফুলবাগানের [illegible]ন মনে ভাববো। কি? রাজি?"

শম্ভুনাথের মনটা আনন্দে নেচে উঠল, "করুন তিন সত্যি। না হলে বিশ্বাস নেই।"

"বেশ, তাই করলাম। সত্যি, সত্যি, সত্যি।"

অকশনে একটা রাবার শেষ হওয়াতে ওরা সকলে বারান্দাতে বেরিয়ে এসেছে।

"কি রে, তিন সত্যি করছিস্ কেন?" ব্রজেনবাবু বলে উঠলেন।

"কি করি বল? তোমরা ত বলে থাক, শম্ভুনাথের মত ছেলে হয়না। সেই ছেলে আমাকে এক কানা-কড়ি দিয়ে বিশ্বাস করে না। তাই তোমার সাদাসিধে মেয়েটা তিন সত্যি করেছে।"

ওর কথাতে সকলেই বেশ মজা পেল।

"কি ব্যাপার, বলুন ত মিস্ রায়? আপনার মত মেয়েকে তিন সত্যি করাচ্ছে? দেব না কি একটু টাইট্ দিয়ে মল্লিককে?"

"কি কথাই বল্লেন পাত্র সাহেব," মিসেস্ পাত্র বলে উঠল।

"আমরা আর আগের কালের অবলা-সরলা নই। আমাদের ব্যাপার আমরাই সামলাতে পারি।"

উর্মিলা আর শম্ভুনাথ ভাবতে পারেনি, ওদের এই শান্ত পরিবেশে হঠাৎ কথার ঝড় উঠবে। বিশেষকরে উর্মির ভাল লাগছিল না। শম্ভুনাথকে ওর ভাল লাগছে। ঠিকই করেছে, মাঝে মাঝে যাবে ওর ওখানে। মা-বাবাকে সে ভালবাসে, মনে হয়।

তাতেই ত মনের অর্ধেকটা কেড়ে নিয়েছে।

বাকি আছে অর্ধেকটা।

উর্মিলা ইচ্ছে করেই কথার মোড় দিল ঘুরিয়ে।

"কারা জিতল, মা ?"

"তোর বাবা আর মিসেস্ পাত্র। আরম্ভেই ত তোর বাবা শপথ নিয়ে শুরু করেছিল। রেখেছেও সেটা। এখন শক্ত মনে আমাদের শপথ নেবার পালা। জিতবই, জিতবই কি বলেন, মিঃ পাত্র ?"

"একদম ঠিক কথা। এবার আমরা ওদের হারিয়ে দিই। তারপর ডঃ রায় আর মল্লিক খেলবে।"

"ওরে বাপ্ রে। আমার দ্বারা হবে না। অত মনে রাখতে আমি পারিনা। চিড়েতনের মন্ত্রী কোন্ রাণীর পিছু পিছু গেল চলে। রুহীতন ক'জন বেঁচে আছে, আর ক'জন গেছে মরে। নিজের মাত্র একটা জিনিসেরই হিসেব রাখতে পারি না। জিজ্ঞেস করুন মাকে। কলেজে যাবার সময় মা সব ঠিক না করে দিলে চলে না।"

মিঃ পাত্রর মনে হল, এই দু'জন বোধ হয়, একটু নিরিবিলিতে বসতে চায়। তাতে বাদ সাধতে চেষ্টা করাটা সত্যিকারের বড় অকরুণ হবে।

তাই বুঝি বলে উঠলেন, "চলুন মাযাদেবী, তাড়াতাড়ি খেলা আরম্ভ করা যাক্ ওরা, বেচারারা ত হারবে, জানা কথাই।"

সবাই চলে গেল। আগের শান্ত পরিবেশটা এলো ফিরে। মনে হল, বারান্দাটাও তাই চাইছিল। কান পেতে শুনবে এদের কথা।

কলকাতা ছাড়ার পর থেকে সবারই মনে হচ্ছিল সোনার খাঁচায় ভরা দিনগুলি যেন একটা করে বেরিয়ে আসছে। এই খাঁচার চাবি বুঝি কোন দৈত্যের হাতে ছিল। সে খুলত টিপে টিপে। তার আনন্দ মুখ তাকে দেয় ব্যথা। সে যেন হঠাৎ গেছে মারা। তাই খাঁচা খোলা রয়ে গেছে। তাই এই অফুরন্ত আনন্দের দিনও শান্তির দিন।

মায়াদেবীর এক এক সময় ভয় হয়, হঠাৎ কোন দিন বুঝি এই

খাঁচার দরজাটা ঝড়ো হাওয়াতে যাবে দুম্‌ করে বন্ধ হয়ে। আশা করতে পারেন না, এ-ভাবে তাদের শেষের কটা দিন কাটবে।

তাঁর স্বামীর দুই বন্ধুরই মাথা গুঁজবার জায়গা আছে। অবশ্য একজন ত কাজ করতে করতে চলে গেছে। মাথা গুঁজবার আর তার কোন দরকার হয়নি। তখনই মনে হয়, তিন বন্ধুর তিন স্ত্রী, যারা ছিল তিনটা বোনের মত, তাদের একটা ত চলে গেছে অনেক আগে। বাড়ী করার কথাই ওঠে না সে বয়সে। আছেন তারা দু'জনে। বাণী আর উনি।

বাণীর কথা মনে হতেই মনটা গেল দমে। অনেক বছর হল স্বামী হারিয়েছে। সারাজীবনের সঙ্গী হারানো যে কি দুঃখের। ছেলে-মেয়েরা বড হয়ে দূরে দূরে। একক জীবন।

ঠাণ্ডা মাথায় যখন সব কিছু চিন্তা করেন, মনে হয়, ভগবানের অশেষ কৃপা তার ওপর। জীবন-সঙ্গী চোখের সামনে। উর্মির মত মেয়ে। অনুপও ভালই। এখানে আসার পরে মনটা কেন জানি অনেক স্থির ও শান্ত হয়েছে। তাইত বুঝতে পারেন এবং এসব কথা ভাবতে পারেন।

ব্রীজ খেলোয়াড়রা চলে যাবার পর উর্মি ও শম্ভুনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল পাশাপাশি। এই স্তব্ধতার মধ্যে সান্নিধ্যটা যেন কথা কয়ে উঠেছিল। সে কথাতে কোন শব্দ নেই। তাই, বোধ হয় সেটার গভীরতা অনেক, অনেক বেশী।

কেউ জানতে পারল না, কার মনে কি কথার ঢেউ উঠ্‌ছে। তা সত্ত্বেও মনে হল এইভাবে পাশাপাশি বসে ওরা সুখ পাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে।

সেদিন অন্ধকার থাকতেই ওরা সকালের খাবার খেয়ে ফেলল। কথা ছিল, ভোরের প্রথম আলোর রেখা পৃথিবীতে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা বেরিয়ে পড়বে জগতের নাথকে প্রণাম করবার উদ্দেশ্যে। কথা রেখেছিল মিঃ ও মিসেস্‌ পাত্র। ভোরের আলো ফুটতে না

ফুটতে ওরা এসে দাঁড়াল দরজায়। ড্রাইভারের সঙ্গে বসল মল্লিক আর পাত্র। বাকি চারজন পিছনে।

সবাইকে ঠিক করে বসিয়ে স্বল্প জায়গা নিয়ে বসেছিল ঊর্মিলা। বলেছিল—আমার অভ্যেস আছে কম জায়গাতে আরাম করে বসতে।'

গাড়ী চলল ছুটে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ও স্নিগ্ধতাতে সবই তৃপ্ত। একটু পরে কাঁচা রোদ পড়ে দু'ধারের বনের ভিজে পাতা ঝিক্‌মিক করে উঠেছে। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে দোয়েল, শ্যামা ডালে বসে গলা সাধতে বসেছে। এদের কাছ থেকেই কি মানুষরা শিখেছে ভোরে গলা সাধতে হয়? হবেও বা।

কত কথা মনে হচ্ছে ঊর্মির। দু'চোখ ভরে ও দেখছে আর কত কথা ভাবছে। চেয়ে দেখল, দুটি খঞ্জন পাখী মনের খুশীতে নাচছে। চুপচাপ সব দেখতে বড় ভাল লাগছিল ওর।

শুধু নিজেকে সাথী করে সময় কাটানোর মত আর বুঝি কিছু নেই। ঊর্মির রুটিন করা জীবনে যে সময়ের বড় অভাব। অনুপ বাড়ী ভাড়াটা দিয়ে খালাস। ওরও নিজের সংসার বেড়েছে। তারই রোজগারে তাদের তিনজনের সংসার চলে। ডাক্তার আর ওষুধই ত কত টাকা চলে যায়। মা-বাবার বয়স হয়েছে। এদিকে খরচ বাড়াটাই স্বাভাবিক। বাইরের চাল-চলনটাও কমাতে দেয়নি। বড় ব্যথা পাবে দু'জনে।

মায়াদেবী অনেক সময়েই বলেন—'রান্নার লোকটা তুলে দিলে হয়। এত খরচ তুই সামলাবি কি করে?' ও উত্তর দিয়েছে—'তা হবে না মা। আমি মনে বড় ব্যথা পাব। আমাকে তুমি অকেজো মনে কর?'

তাই আর মায়াদেবী কিছু বলেন না।

ঊর্মি বলে দিয়েছে—'বাবা যে কটা টাকা পেনসন পান তা তোমাদের জয়েণ্ট একাউণ্টে জমা হবে। সংসারের কোন কিছুর জন্য তা খরচ হবে না। জামা-কাপড়, ওষুধ-পত্তর, খাওয়া-দাওয়া, ইত্যাদি যাবতীয় খরচ হবে তোমার মেয়ের রোজগারে। আমাকে সেই

তৃপ্তিটি পেতে দাও। এখনও অনুপের কাছ থেকে ফ্ল্যাট ভাড়াটা নিতে হয়। আশা করি, কয়েক দিন পরে তাও নিতে হবে না।'

হঠাৎ উর্মিলার খারাপ লাগল। একি, ধান ভান্‌তে শিবের গীত আরম্ভ হয়েছে। এত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে চলেছে। তা সে নেবে মন ভরে; না রোজকার জঞ্জাল দিয়ে মন ভরছে। বাকি চারজনের তৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বড় ভাল লাগল। যাক্, তার ছোঁয়া কারও লাগেনি।

দেখতে দেখতে ওরা পুরীতে এসে ঢুকল। পুরীতে ঢুকেই উর্মিলার মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথর চারটি লাইন:

"পথ ভাবে আমি দেব,
রথ ভাবে আমি;
মূর্তি ভাবে আমি দেব,
হাসে অন্তর্যামী।"

পাশ থেকে ব্রজেনবাবু বলে উঠলেন, "পুরীতে ঢুকেই কোন কথাটা তোর সবার আগে মনে হয়েছে, বলত?"

উর্মিলা চারটি লাইন আবৃত্তি করল।

ব্রজেনবাবু খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন, "দেখ, দেখ মায়া, আমি যে বলি, মেয়ে যে আমার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমারও এই কবিতাটাই সব কবিতা ছেড়ে মনে হয়েছে।"

সামনে থেকে মিঃ পাত্র বলে উঠলেন, "দূরছাই, আমার কত কথাই মনে হল, এই কবিতাটি বাদ দিয়ে।"

দেখা গেল পাঁচজনের মধ্যে বাকি তিনজনই নিজের নিজের মনে আলাদা আলাদা চিন্তা করেছে।

"তবেই দেখ, ঠিক এক ধরনের মানুষ সংসারে কত বিরল," ব্রজেনবাবু বললেন।

"ভাগ্যিস্, না হলে ত পৃথিবীটা হয়ে যেত একঘেয়ে। উর্মিলাদেবী আমাদের সবাইকে বাঁচালেন। না হ'লে যেন কেমন কেমন লাগছিল," মিঃ পাত্র বলে উঠলেন।

দেখা গেল মিসেস পাত্র নিশ্চিন্ত মনে এক ঘুম দিয়ে উঠেছেন,—"আমি, মনে হচ্ছে, সবার চাইতে বেশী লাভ করেছি। কম ঘুমটা নিলাম পুষিয়ে।"

"শুনলেন ত, আমার গিন্নির কথা। একদম বেরসিক। না, কিছু হবে না তোমার।"

"কেন? আমার ত মনে হচ্ছে, সবার মধ্যে আমারই কিছু হয়েছে।

মল্লিক সামনে থেকে বলে উঠল, "ঠিকই ত। উনি হাতে হাতে পেয়ে গেছেন। আর আমাদের সবই হচ্ছে ধারে কারবার। কিছু পাব কি পাব না, কিছু হবে কি হবে না।"

এরপরে আর নূতন করে কারো কিছু বলার রইল না গাড়ী ততক্ষণে ঢুকল গভর্মেন্ট গেষ্ট-হাউসের গেটে। হাতমুখ ধুয়ে চটপট্ এক কাপ চা খেয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল জগন্নাথ মন্দিরের দিকে। পাত্ররা সেদিন রাতেই ফিরে যাবে। তাই তাড়াহুড়ো করে সকলে বেরিয়ে পড়ল। পরের দিন থেকে বাকিরা ধীরেসুস্থে সব দেখবে।

মিঃ পাত্র বলে যাচ্ছিলেন, "আপনাদের আর এই পৃথিবীতে জন্মাতে হবে না।"

"কি রকম?—মায়াদেবী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।"

"প্রবাদ আছে—এখানে তিন রাত্রি বাস করলে আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় না।"

"এই যা! কি হবে?—"—উর্মিলা বলে উঠল।

"আপনার আবার কি হল," মল্লিক ফিরে চাইল।

"বারে। পড়েন নি,—মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।"

"সে ত কবির কথা।"

"আমারও যে সেই কথা—নিজেকে না জড়িয়ে আমি যে বাঁচতে চাই এই সুন্দর পৃথিবীতে। এক জন্মে কতটুকু দেখা যায়? এরজন্য যে বারে বারে আসা দরকার।"

মায়াদেবী বুঝলেন, তার ভাবুক মেয়ের কথায় সবাই যেন কেমন

দিশেহারা হয়ে পড়েছে,—"নে, তোর কথা রাখ। মিঃ পাত্র, আপনার কথা আমরা শুনতে চাই। নূতনদেশে এসেছি। কত ভাগ্য আমাদের যে এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।"

সবাই বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। প্রথম যা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে, মানুষের ভীড়। ভীড় বললে কম বলা হয়। মনে হয় মানুষের সমুদ্র। ভুবনেশ্বরে মনেই হয় নি উড়িষ্যাতে এত লোক আছে। এখানে অবশ্য যারা ভারতবর্ষের লোক, ভীড় করে পুণ্যের লোভে। তাছাড়া পশ্চিমের টুরিস্টও কম যায় না। নীলগিরি পাহাড়ের উপরে এই মন্দির। হিন্দু ছাড়া এখানে কারও ঢোকা নিষেধ। অহিন্দুরা রঘুনন্দন লাইব্রেরীর ছাদ থেকে খুব ভালভাবে দেখতে পারে। তাই সবাই দেখতে পারে। তাই সবাই দেখে।

ব্যবস্থা ভাল। মনক্ষুণ্ণ হয়ে কাউকেই ফিরে যেতে হয় না। এই লাইব্রেরীর কাছে পিঠে অনেক ধর্মশালা আছে। পাত্ররা খৃশ্চিয়ান, তাই ওর লাইব্রেরীর ছাত থেকে পুরীর মন্দিরের জগন্নাথের মূর্তি দেখবে ঠিক করল। অবশ্য আগেও অনেকবার দেখেছে।

মিঃ পাত্র বলেছিলেন,—"কতবার দেখেছি। ভেতরে ঢুকতে পারি না; তবু কিসের টানে যেন বারে বারে আসি। দূর থেকে বারে বারে প্রণাম জানাই। এ হচ্ছে যুগ-যুগান্তরের রক্তের টান। বংশানুক্রমে বয়ে চলেছে। একে বাদ দেওয়া যায় না।"

"আমরাও সবাই লাইব্রেরীর থেকেই দেখি।"

"তা কেন, ব্রজেনবাবু।"

"চোখের দর্শনের চাইতে মনের দর্শন বড়। ছাত থেকে তুইই হবে।"

মিঃ পাত্র বুঝলেন একসঙ্গে দেখার আনন্দের থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চাইছে না। ওপর থেকে মন্দিরের ভেতরে দৃষ্টি দিয়ে জগন্নাথের মূর্তির দিকে চেয়ে মনের মধ্যে কি যে হল ঊর্মিলার। সোনার কাঠি কে যেন ছুঁইয়ে দিল সারা দেহে, সারা মনে।

বারে বারে একটা কথাই মনে আসতে লাগল—যা বলি, তা কি সত্য? কথার জাল বুনে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য কি করি না? যা চাই, তা চোখ ঠেরে শুধু যে পরের কাছে মিথ্যাচার করি, তা ত নয়, নিজেকেও ঠকাই। মনে মনে কি সে শম্ভুনাথকে আপন করতে চাইছে না? তার দেহ কি চাইছে না, পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে মিলতে? মনেও ত সেই আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে মল্লিককে আমি ভালবাসি। তবে কেন সে এই মিথ্যার আবরণে নিজেকে চাইছে ঢেকে রাখতে?

মনে পড়ে গেল অনেক আগের ছেলেমানুষটা। মন শান্ত হয়ে এলো। দেহের টানাপোড়েনের কোন সত্য মূল্য নেই—যদি না সেখানে থাকে চিত্তের শুদ্ধতা। সেই চিত্তকে বুঝতে সময় নিতে হবে। যেদিন সে উপলব্ধি করবে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে মনের টান, যা সে এখন বোধ করছে, তা একই থাকে, তবেই ত প্রেম। তা বুঝবার জন্য চাই সময়। সে সময়ই ত সে নিচ্ছে। সত্যিকারের ভালবাসা ত শুধু পেতে চায় না, ছেড়েও যেতে চায়। তাকে নিজেকেও যেমন বুঝতে হবে, শম্ভুনাথকেও দিতে হবে সময়।

মিঃ পাত্রের কথায় উর্মিলা ফিরে দাঁড়াল।

"জানেন ডঃ রায়, এই মন্দির, বলতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পৃথিবী। ছ'শ ব্রাহ্মণ ও কুড়ি হাজার এই মন্দির ঘুরে দেখাবার লোক এরই উপর নির্ভর করে, মানে জীবনযাত্রা তাদের এখান থেকেই হয়। ভক্তদের প্রণামী ত এখানে কম পড়ে না। পুরীর রাজা, অন্যদিকে বলতে গেলে, চলন্ত দেবতা। ভক্তবৃন্দের তাঁর ওপর অগাধ শ্রদ্ধা। উনিই একমাত্র সেবক যিনি রথযাত্রার দিন মূর্তির ছাতা ধরতে পারেন। ঘড়ির কাঁটার মত মন্দিরের যাবতীয় কাজ চলে। তাতে এতটুকু এদিক-সেদিক হয় না।"

পাত্রের কথা শুনতে শুনতে সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়েছিল।

"আপনি সঙ্গে থাকাতে আমাদের কতকিছু যে জানা হোল।"

মায়াদেবী দূর থেকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বাকিরা সকলে চোখ বুঁজে হাত জোড় করে রইল। সকলেই নিশ্চয়ই মনে মনে কিছুর জন্য প্রার্থনা করল। সকলেই সাধারণ মানুষ।

রক্ত-মাংসে গড়া একটা মানুষ বলেছিলেন মাকালীকে, "তোমাকে চাই।" এত বড় চাওয়া, বোধ হয়, আর কেউ চাইতে পারেনি।

নেমে এলো সকলে ছাত থেকে। সবাই শান্ত, নিবিষ্ট চিত্ত। মনে হল জগন্নাথ ঠাকুরের প্রভাব ক্ষণকালের হলেও এই ক'জনের উপরে পড়েছিল। সমুদ্রের ধারে গিয়ে সকলের মুখ খুলে গেল। ঢেউয়ের চঞ্চলতা ও গর্জন মানুষের মনে জাগায় চঞ্চলতা।

"মল্লিক সাহেব, আমার ঐ রাক্ষুসে ঢেউ দেখলে কেমন ভয় ভয় করে। মনে হয়, ওদের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনের শান্তি যাবে নষ্ট হয়ে।"

"ঠিকই বলেছেন ডঃ রায়। তবে কি জানেন, এরা বোধ হয়, বোঝাতে চেষ্টা করে তিন ভাগ যেমন জল, তেমনি তিন ভাগ হচ্ছে দুঃখ।"

"হবেও বা। তাও আমি বলব, আমি এক ভাগ শান্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই। তাই বুঝি, হিমালয়ের শান্ত শ্রী আমাকে টানে।"

"অশান্ত মন নিয়ে?"

"হ্যাঁ, অশান্ত মন নিয়েও। একটা ছোট্ট ক্ষীণ আশা নিয়ে কোনদিন না কোনদিন যদি পাই সে অমূল্য যত্ন-শান্তি।

ওরা চেয়ে দেখল কত কথা বলতে বলতে বাকি চারজন অনেক এগিয়ে গেছেন।

"আমার কেন জানি, ইচ্ছে করছে ছুটতে। আসুন, আমার হাত ধরুন।"

দু'জনে ছুটে গিয়ে হাজির হোল আর সকলের কাছে।

পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে ঊর্মি বলে উঠল, "বলত কে?"

"আমার মিষ্টি দুষ্টু মেয়ে।"

সবাই গিয়ে বসল জলের ধারে।

মিসেস্ পাত্র বলল, "একটা গান করুন না, মিস্ রায়।

"বেশ ত। কোন আপত্তি নেই। এমন পরিবেশ, তার উপরে রয়েছেন আপনারা সকলে :

"সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে,
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।"

সকলের এত ভাল গেলেছিল যে উর্মির আবার গাইতে হয়েছিল ?

রাত হয়ে গেছে অনেকটা। পাত্রদের আবার রাতের খাওয়া সেরে ভুবনেশ্বরের পথে পাড়ি দিতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবাই উঠে পড়ল আগের বারের চারজন এগিয়ে গিয়েছিল। শম্ভুনাথ আর উর্মিলা পিছিয়ে পড়েছিল।

"আপনার গান শুনতে শুনতে মনে হল আপনিই ত তুলনাহীনা, যাকে আমি পেয়েছি দেখতে বিশ্বের ভীড়ে। প্রথম দিনই সে কথা মনে এসেছে। মনের নিভৃতে। কত ভাগ্য আমার, তাকে আমি দেখতে পাই বারে বারে। আমার কি মনে হয় জানেন, উর্মিলা দেবী ? কবির চাইতে আমি ভাগ্যবান।"

উর্মিলা কোন কথার উত্তর দেয়নি। কানে কথাটা গিয়েছিল ঠিকই। চোখ ছিল সমুখের দিকে আর মন ছিল ভরে এমন এক ভাবনাতে যে কারোই প্রবেশ সম্ভব নয় সেখানে। একান্ত চিন্তা।

সবাই রাতের খাবার তাড়াতাড়ি সেরে নিল। পাত্ররা বিদায় নিল। সবারই মনটা ভারাক্রান্ত আগামী তিন দিনের বন্ধু বিচ্ছেদের জন্য। শোবার জন্য ঘরে গিয়ে ঢুকল সবাই। কারও মুখে কোন কথা ছিল না।

হতে পারে এই নীরবতার মনের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। সারাদিনের পরিশ্রমই এর একমাত্র কারণ। দু'দিন ভরে ওরা বেশীর ভাগ সময় কাটাল সমুদ্রের ধারে। তাছাড়া জগন্নাথের মন্দির ত আছেই।

দূর থেকে আর ওদের দেখতে হয়নি। খুব কাছ থেকেই হয়েছিল দর্শন।

রথযাত্রার দিনের কথা কত শুনল। জগন্নাথের মূর্তিকে কত

সমাদরে সমারোহে রথে করে নিয়ে যাওয়া হয় গুণডিচা মন্দিরে। ওটা হচ্ছে জগন্নাথের বাগানবাড়ী। প্রায় দু'লক্ষ তীর্থযাত্রী এই বাগানবাড়ীতে এসে আনন্দে, উৎসবে মেতে ওঠে। তীর্থযাত্রীদের বুঝি সেদিনটার কথা মনে পড়ে যায়। হাজার বৎসর আগে সেদিন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল থেকে মথুরাতে গিয়েছিলেন। সাত দিন জগন্নাথ থাকেন বাগানবাড়ীতে। আবার হয় তার প্রত্যাবর্তন। সেই রকম আনন্দ ও জাঁকজমকের মধ্যে। দু'টো ছোট ছোট রথে সঙ্গে থাকে তাঁর বোন সুভদ্রা ও ভাই বলরাম। অনেক অনেক আগে লোকেরা তাঁর রথের চাকার নিচে পরে মৃত্যু বরণ করত। লোকের অন্ধবিশ্বাস ছিল, এই রকম মৃত্যুতে মানুষ সোজা স্বর্গে পৌঁছাতে পারবে। এ যুগে আইন করে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বর্গে যাবার চেষ্টা করলেই তাকে যেতে হবে জেলখানায়।

এক পাণ্ডার মুখে এই কথা শুনে উর্মি আর হাসি থামাতে পারে না, "দেখেছ মা, যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। আজকালকার আমরা যে কি হয়েছি? স্বর্গ আর জেলখানাকে এক পর্যায় ফেলেদিয়েছি।"

মল্লিক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "মন্দ কথা কিন্তু আপনি বলেন নি। প্রায়ত একই রকম।"

"এ আবার কি কথা বললে, বাবা," মায়াদেবী বলে উঠলেন।

"কেন? অন্যায়টা কি বলেছি। জেলখানার সবচাইতে অসুবিধাটা হচ্ছে নিয়ম মেনে চলতে হবে। ইচ্ছে মত কিছু করা চলবে না। স্বর্গেও ত তাই। সমানেই উর্বশী, মেনকা, রম্ভার নাচ হচ্ছে তাই দেখতে হবে। একঘেয়ে হয়ে গেলেও তাই দেখতে হবে। ইচ্ছে হচ্ছে ক্যারি গ্র্যাণ্টের হাসির ছবি দেখতে বা রোম্যান হলিডের মত অপূর্ব ছবি দেখতে। কিন্তু সেটা চলবে না। চুপচাপ বসে বসে সোমরস খাও আর নাচ দেখ।"

সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

ব্রজেনবাবু বলে উঠলেন, "বড় ঠিক বলেছে, ছেলেটা। আমরা কেমন অভ্যেসবশতঃ বলে চলি স্বর্গে যেতে পারলে বাঁচি। এমনভাবে

ত কোনদিন ভেবে দেখিনি। এখন থেকে বলতে হবে—ভালবেসে ছিনু এই ধরণীরে, ভালবেসেছিনু।"

ঊর্মিলার মনে হোল, বাবা বড় ঠিক কথা বলেছেন। আমরা নানা কাজে, নানা ভাবনার মধ্যে দিন কাটাই। অগোচরে মনের কোনে নিশ্চয়ই কথাটা থাকে। আমরা কিন্তু ভুলে যাই, ভুলে থাকি। কত বন্ধন, কত ভালবাসা আমাদের এই পৃথিবীকে। আমরা নানা ছলে, নানা ভাবে সেই কথা ভুলে থাকতে চাই। অনেক সময়ই মানুষ তার ভালবাবাসার জনের দোষের দিকটাই বলে, আলোচনা করে। তাই শুনে লোকে যদি ভাবে, এর টান কম, তার মত ভুল বুঝি কিছু নয়। তাই, বোধ হয়, মানুষ পৃথিবীর প্রতি ভালবাসাটা লুকিয়ে রাখতে চায় মনের মধ্যে অতি সাবধানে। বারে বারেই তাই, নানা সুরে, নানা ভাবে স্বর্গের গুণকীর্তন করে।

ফিরে এলো ওরা ভুবনেশ্বরে ক'দিন পুরী থাকার পর ভুবনেশ্বরের আস্তানাকে বড় আপন মনে হোল। মনে হোল বুঝি, ওরা বরাবর এখানে থাকে। জানকী হেসে চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়ায়। মালী বাজারের থলি ঝুলিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে যায়। শম্ভুনাথ বরাবরই ওদের সঙ্গে থাকে। পাত্র, মিসেস্ পাত্র মাঝে মধ্যে এসে তাস খেলে। ক্লাবেও যায় ওরা।

ঊর্মিলা ভাবছিল কলকাতার ছবিটা কি সরে যাচ্ছে, আব্ছা হয়ে যাচ্ছে? ওর রুটিন বাঁধা দিনগুলো মনের কোন কোনে যেন মুখ লুকিয়েছে। তাদের অনেক টেনে টুনে সামনে আনতে হয়।

তাছাড়া, মল্লিকা তার এতকালের প্রাণের বন্ধু। সেও যেন কেমন মিলিয়ে যাচ্ছে। ক'দিন হোল, ওর চিঠিটা এসে পড়ে আছে। লিখতে আলসেমী লাগে। মনে হয়, এই পরিবেশ, যাকে মনে হয় সত্য, তার একটা পাশ যদি আচম্কা ছিঁড়ে যায়

সত্যি, মানুষের মন বড় বিচিত্র, ঊর্মিলা ভাবে। সবচাইতে যা সত্য, তা হচ্ছে মানুষ চায় একটু স্বস্তি, শান্তি। তাই বুঝি সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তার এক কণা পাবার জন্য সে বুঝি সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কতটা

ছাড়তে পারবে, তা সে জানে না, তা সে বোঝে না বলেই যত মুশকিল। কেউ যদি তাকে বুঝিয়ে দিতে পারে....।

"তখন থেকে কি এত ভাবছিস রে? মল্লিক ক্লাবে যেতে বলল। ওর সঙ্গে গেলি না। আমি আর তোর বাবা, আমাদের সঙ্গে হাঁটতে যেতে বললাম, উঠলি না। জানকীর কাছ থেকে এক কাপ চা নিয়ে বসলি বারান্দাতে। ফিরে এসে দেখছি চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তুই একভাবেই বসে আছিস।" মায়াদেবী এসে কাছে বসলেন।

"জানই ত মা, আমি বাবার মত ভাবুক। সেই ভূতটা যখন মাথায় চাপে, তা নামতে চায় না। কাজের টানা-পোড়েনে কলকাতার ভাবনাটাকে তাড়িয়ে দিই, ভয় দেখাই। বলি এখনও সময় আসেনি। সময় হলেই তোমার সঙ্গে বসব একান্তে। বুকের মধ্যে সে মুখ লুকোয়। প্রায়ই মাথা চাড়া দিতে চেষ্টা করে; ঠিক পেরে ওঠে না। তাকেই দিয়েছি আবারিত দ্বার।"

মায়াদেবী চুপ করে মেয়ের কথা শুনছিলেন। একবার মনে হোল বলেন,—'কিরে, মল্লিককে কেমন লাগছে?' বলা হোল না। এই রকম যার মন, তাকে ভাবতে সময় দেওয়া দরকার। মনে পড়ল, নূতন বিয়ের পরে স্বামীকে বুঝতে তার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এত সুখী ছিলেন, স্বামীকে দিয়ে যে এদিকটার জন্য দুঃখ পাননি। বরঞ্চ সব সময় চেষ্টা করেছেন তাকে বুঝতে, তার ভাবুক মনের নাগাল পেতে। পেয়েও ছিলেন। তাই ত এই সৃষ্টিছাড়া মেয়েটাকে বোঝেন যেমন, ভালও বাসেন তেমনি।

"কি হোল, মা? তুমি একেবারে চুপ করে গেলে?"

"বাবা আর মেয়ের মাঝখানে, তোদের ভাবুক মনের ছোঁয়া লাগবে না?"

ব্রজেনবাবু বারান্দায় আসতেই কথাটা কানে গেল।

"সেটি চলবে না, মায়া। দুই ভাবুক ত তবে পথে বসব।"

"সে চিন্তা কোর না। তোমার মেয়ে সর্বগুণে গুণান্বিতা," আদর করে মায়াদেবী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

উর্মিলা দুষ্টুমি করে একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা আর বলা হোল না। মিষ্টি আদরটা পেয়ে মনে হোল—এই ত শাস্তি।

ভুবনেশ্বরে থাকার দিন ওদের এলো ফুরিয়ে। পনের দিনের জন্য বেরিয়ে হয়ে এলো কুড়ি দিন। এই দিনগুলিকে ফেলে যেতে কারো মন চাইছিল না। তাই, আজ-না-কাল করতে করতে দিন বেড়ে চলেছিল। উর্মিলার ক'টা দিন হাতে আছে ঠিকই, কিন্তু মল্লিকের নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। আসছে কাল সেই দিন।

"চলুন না, সবাই গিয়ে প্রথম উঠবেন আমার ওখানে। সকালের ট্রেনে ত রওনা হচ্ছি। দুপুরের খাবারটা আমার," বলে শম্ভুনাথ তাকাল ব্রজেনবাবুর দিকে।

এতদিন একসঙ্গে থেকে ওরা বেশ অনেকটা কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। কলকাতাতে এক জায়গাতে থেকেও কিন্তু এত দিনে তা হয়নি।

এক জায়গাতে থাকা আর এক বাড়ীতে থাকার মধ্যে কত তফাৎ, শম্ভুনাথের মনে হয়। মনে হয়, এতগুলো বছর সে বৃথাই নষ্ট করেছে। এই বুদ্ধিটা কেন তার হয়নি। ঠিকই ত একটা শহরে থাকে অফুরন্ত লোক। একটা বাড়ীতে থাকো গোনাগাথা।

আবার মনে হয়, এবার ত তার বুদ্ধিতে কিছু হয় নি। অদৃশ্য কোন শুভ গ্রহের টানে হয়েছে। শুভ গ্রহই ত। তাই, তাকে আর উর্মিকে কতটা কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। মনের নাগাল সে পেয়েছে।

উর্মির তাকে ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে, তা নয়, অনেকটা ভাল লাগে। অনেক, অনেকটা ভাল লাগে। এর থেকে ফিরে যাবার পথ আর নেই, সে বেশ বোঝে। উর্মিকে সে পাবে আপন করে, সে বিশ্বাস তার হয়েছে। শুধু এখন প্রতীক্ষা।

"বেশ ত, শম্ভুনাথ, তাই হবে। ওখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর খোঁজ করতে হবে রবিটা এসেছে কিনা।"

"এটাই খুব ভাল বুদ্ধি করেছেন। না হলে, বোধ হয়, একটু

মুশকিলই হোত। সেই ভাবনাতে একটু পড়েছিলাম। আমিই অবার বুদ্ধি করে ওকে ছুটি দিয়েছিলাম।"

"দেখলেন ত উর্মিদেবী, আমার বুদ্ধি নেই নেই করেও কিছু কিছু আছে।"

"বারে! আমি কি তাই বলতে পারি? এত বড় এক ফার্মের একজিকিউটিভকে?"

তোমাদের জন্যই এবার আমাদের শরীরটা সারল। উর্মির পক্ষে দুই রোগী নিয়ে বের হওয়া সম্ভব হোত না," মায়াদেবী বললেন।

"আপনি আপনার মেয়ের ক্ষমতা জানেন না। তাই এ কথা বললেন। উনি ঠিকই আপনাদের হাওয়া বদলাতে নিয়ে বের হতেন। আমি না হলে, কাউকে না কাউকে জোগাড় করতেন। আমার ভাগ্য যে আমি সেই সুযোগ পেলাম।"

উর্মিলা বাক্স গোছাতে গোছাতে ফিরে দাঁড়াল দুই হাত কোমরে দিয়ে, "কি বলতে চান আপনি, আমার শুধু জোগার করার ক্যাপাসিটি আছে?"

"বাবাঃ, যে ভাবে দাঁড়িয়েছেন, মনে হচ্ছে ধরে আচ্ছাসে····।"

"সেটাই দিতাম এবং বুঝিয়ে দিতাম, কত দিকে ক্ষমতা আছে।"

ওর রাগ দেখে মল্লিক হেসে ফেলল, "দিন না, কয়েক ঘা কষিযে। বেয়াদপির অভ্যেসটা যাবে চলে।"

"তাই দিতাম, যদি বাবা-মা কাছে না থাকত।"

চারিপাশে তাকিয়ে দেখল, ধারে-কাছে কেউ নেই। মিঃ ও মিসেস রায়ের উর্মির রাগ দেখে ভালই লাগছিল; তাই বুঝি সরে পড়েছিলেন সুযোগ দিয়ে।

উর্মিলা সে সুযোগ নিল না। সামনে কাজ, গোছগাছ।

তাই শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'টিকিট কাটা হয়েছে?"

"হাঁ, মহারাণী। আপনার গোলামকে অতটা অকেজো ভাববেন না।"

ততক্ষণে রাগটা জল হয়ে গেছে উর্মির। তাই হেসে ফেলল।

"একটা কথা ঠিক—আপনি কিন্তু বেশ নিষ্কর্মা।"

"কি রকম?"

"আমি গোছাচ্ছি, আর আপনি মুখ চালাচ্ছেন।"

শার্টের হাতাটা গুটিয়ে শম্ভুনাথ শশব্যস্তে এলো এগিয়ে, "বলবেন ত, কি করতে হবে?"

"বেশ, বাবার বাক্সটা ভাল করে গুছিয়ে ফেলুন।"

ঝুপ-ঝাপ করে ব্রজেনবাবুর কাপড়-চোপড়গুলো ফেলে দিল ও সামনে। ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছেন ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবী।

"তুমি বাবা, কি করবে? দাও, আমি করছি," মায়াদেবী বললেন।

"না, তা হয় না। আমাকে দিন করতে। আমাকে এই পরীক্ষাতে পাশ করতে হবে।"

"শুধু পাশ করা নয়। ভাল নম্বর পেতে হবে।"

"শুনলেন ত, আপনার মেয়ের কথা। না হলে শাস্তি আছে কপালে।"

সতের

শম্ভুনাথ গুরুগম্ভীর মুখ করে গোছানোতে মন দিল।

"ওরাই গোছাক। চল, আমরা দু'জনে শেষ দিনে বাগানে একটু ঘুরি। কাল থেকে ত বাগান হবে দিল্লি দূর অস্তের অবস্থা।"

দু'জনে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ব্রজেনবাবু বললেন, "আহা, ওদের দুটাতে যদি সত্যিই...."

ব্রজেনবাবুর কথা আর শেষ করা হল না। মায়াদেবী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "কবে থেকে আমার মনে তাই হচ্ছে। মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না। ছেলের বাড়া, আর উর্মিকে খুব ভালবাসে বুঝতে পারি। একটা খুঁত, দোজবর।"

"তোমার মেয়েরও ত খুঁত আছে। মায়া।"

"আছেই ত। তা কি আমি অস্বীকার করছি। জানি না, শেষ পর্যন্ত কি হবে। যা আশা করা করা যায়, তাত কই হয় না। বড়কে

দিয়ে ত একেবারেই নিরাশ হয়েছি। ছোট বৌ ভাল। ছোট ছেলে ভাল। তাও যেন এক এক সময় মনটা খুঁতখুঁত করে। ভাবি, আমার মনের দোষ। তাই কিছু আশা করতে গিয়ে পিছিয়ে যাই।"

"না, মায়া না। অমন কোরে বোল না। আমরা উর্মিকে নিয়ে শান্তি পাব।"

ততক্ষণে দু'জনে চার জনের চারটা সুটকেশ গুছিয়ে হাসি মুখে এসে বাগানে হাজির হোল।

সকালে মিঃ পাত্র এসে ওদের নিয়ে তুলে দিল প্লেনে।

জানকী ভোলেনি তার মনের কথা জানাতে। দিদিমণির বিয়েতে যেন ওদের ডাক পড়ে। কথা ত দিয়েছেন মায়াদেবী, সেই আনন্দের দিনে ওদের তারা ভুলবে না।

ফোন করে মিঃ মল্লিক বেয়ারাকে দুপুরের খাবার তৈরী করতে বলে দিয়েছিল। টিভোনি কোর্টের একটা ফ্ল্যাটে মল্লিক থাকে। কোম্পানিই ভাড়া দেয়। দুটা শোবার ঘর। লাগোয়া বাথরুম। বিরাট বসবার-খাবার ঘর। খুব সুন্দর সাজানো। কোম্পানীর থেকে সাজিয়ে দিয়েছে।

বেয়ারা হুকুম মত একটা শোবার ঘরে পরিপাটী করে মিঃ ও মিসেস্ রায়-এর জন্য বিছানা ঠিক করে রেখেছিল। বুদ্ধিমান বেয়ারার মনে হয়েছিল এই বুঝি তাদের ভাবী মেমসাহেব ও তার মা-বাবা। তাই বুঝিয়েছিল ছোট ছেলেটাকে, যে তার নিচে কাজ করে—যদি টিকে থাকতে চাস, এদের যেমন করে পারিস খুশী করে দিবি। নিজেও ঠিক করেছিল তাই।

ট্যাক্সি থামতেই মল্লিক অবাক হয়ে দেখল, তার দুই শ্রীমান ছুটে এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। তাকে পাশ কাটিয়ে ওদের সবাইকে লম্বা লম্বা সেলাম ঠুকল দু'জনে। তারপর যেন তাকে করতে হবে, তাই কোন রকমে সেরে লিফ্‌ট্ থামিয়ে সবাইকে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। বসবার ঘরে বসিয়ে দিয়ে বলল, "অতদূর থেকে আসতে আপনাদের নিশ্চয়ই বেশ তৃষ্ণা পেয়েছে।"

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে চট্‌পট্ চলে গেল আনতে।

"তোমার ফ্ল্যাটটা যেমন সুন্দর, লোকটাও বড় ভাল।"

"ফ্ল্যাটটা ভাল, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে বেয়ারার, বোধ হয়, আপনাদের বড় ভাল লেগেছে। এতটা আগ্রহ সব সময় দেখা যায় না," মল্লিক হাসল।

ততক্ষণে বেয়ারা চার গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ ও তার সঙ্গে এক প্লেট শশার স্যান্ডুইচ্ নিয়ে এলো।

উর্মিলাকে বড় খুশী খুশী দেখাল, আমি যে স্যান্ডুইচের কথাই ভাবছিলাম।

বেয়ারা খুশীমনে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলে গেল—কফির জল রেডি আছে। হুকুম দিলেই নিয়ে আসব।

"বেশ সুন্দর সাজান ত।"

"এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই।"

"বেশ কাণ্ড ত। আমি যখন থাকবার জায়গা বানাব, তখন কিন্তু তা হতে পারবে না। ভালই হোক, মন্দই হোক্, নিজে করব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মল্লিরা যেমন করেছে। হ্যাঁ বুদ্ধি নিতে পারি। তাতে আপত্তি নেই।"

"বেশ ত।"

অজান্তে মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে যাওয়াতে শম্ভুনাথ কেমন অস্বস্তি বোধ করল। মনের মধ্যে যে কথাটা রয়েছে অহোরাত্র, তা হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

উর্মির দিকে তাকিয়ে দেখল, ওর কানে যায়নি। যাক্ বাঁচা গেল। যা মেয়ে, এখনি বোধ হয় লঙ্কাকাণ্ড করে বসত।

অবাক হয়ে মল্লিক ভাবল, উর্মিকে যেমন ভালবাসে তেমনি কি ভীষণ ভয়ও করে। ওত ওর কেউ নয়। তবুও।

বাইরে না হলে কি হবে, মনের ভেতরে যে উর্মি ওর বড আপন। সব চাইতে আপন। তাই বুঝি এত ভয়, যদি কোনভাবে ব্যথা পায়।

ততক্ষণে মিঃ ও মিসেস্ রায় ছোকরা চাকরকে জিজ্ঞাসা করে শোবার ঘরে চলে গেছেন।

"কি যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। ভাল লাগে না। বসে পড়ুন।"

মল্লিকের চমক্ ভাঙ্গল, "ঠিকই ত। আর! ওঁরা কোথায় গেলেন?"

"হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলাতে গেছেন। আপনার মত কর্তার বলার আশায় বসে থাকলে কি হবে বুঝতে পেরে নিজেরাই করে কম্মে নিচ্ছেন।"

কথার সুরটা খুব ভাল লাগল শম্ভুনাথের, "আর আপনি?"

"আমি এতটা সাদাসিধে নই। তাই বসে আছি, যতক্ষণ না বলবেন--আপনি চলুন দয়া করে, একটু হাতমুখ ধুয়ে কফি খান।"

বলতে বলতেই লাফিয়ে উঠে পড়ল উর্মিলা,--"আপনি যা লোক, আপনাকেই আমার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

এই সব কথা যখন হচ্ছিল, সেই সময় বেয়ারা ঘরে ঢুকে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে আবার রান্না ঘরেই ঢুকে গেল।

"কি হোল দাদা?"—ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

"ভাবছিলাম, মেমসাহেবকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

"কি আশ্চর্য। তোমার পছন্দে কি এসে যায়? তাছাড়া, ইনি মেমসাহেব হবেন কি না তার ঠিক নেই।"

"ইনি হবেন, আমি বলছি। তোর আর বক্‌বক্ করতে হবে না। দেখে আয় গিয়ে বসবার ঘরে কেউ এসেছে কি না।"

"তোর মেমসাহেবের বাবা-মা?"

"কেন, তোর না? না, কি আশ্চর্য! কিছুর মধ্যে কিছু না কি আরম্ভ করেছিস্ বল ত?" বেয়ারা কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

"মা, আপনাদের জন্য দু'কাপ কফি আনব কি?"

"তাই আন বাবা। সঙ্গে কিছু এনো না। একটু আগে, তোমার হাতের স্যান্ডুইচ খেয়ে পেট ভরা। ভাল হয়েছে।"

একটু পরে দু'জনে দু'ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কাপড় পালটে।

"উর্মিলাদেবী, দুপুরের খাবার পর ওঁরা বিশ্রাম করবেন। সেই ফাঁকে আপনাদের ফ্ল্যাটটা ঘুরে আসব আমরা। রবি এলো কি না! না হলে ত আপনাদের ওখানে যাওয়া চলতে পারে না।"

"কেন, আমাদের কি এখানে আটকে রাখার মতলব ?"

"বলতে পারেন, তাই। তবে সেই ক্ষমতা ত আমার নেই। অধিকারও নেই। শুধু মিনতি করতে পারি।"

"না, আপনার সঙ্গে আর কথায় পারব না। ঘাট মানলাম।"

বন্ধুর কাছ থেকে, এক ফাঁকে গিয়ে মাল্লিক গাড়ীটা নিয়ে এলো। দুপুরে দু'জনে গেল বেরিয়ে। শম্ভুনাথ ড্রাইভ করছে, আর উর্মি পাশে। শম্ভুনাথ ভাবছে, কবে স্ত্রী হিসাবে উর্মিকে সে পাবে। সেদিন আর কত দেরীতে ? যতদিন বাঁচবে, এই ভাবে ওকে পাশে নিয়ে কি সে পারবে ড্রাইভ করতে ?

ছুটি গেল ফুরিয়ে। মল্লিরা এলো ফিরে। আবার সকলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল। কর্মব্যস্ততার মাঝখানে ছিটে-ফোঁটা অবসর। উর্মিলার যেন আর একটা পরিবর্তন এসেছে। আগের ছকে আঁটা জীবনযাত্রার হয়েছে একটু এদিক সেদিক। ইচ্ছাকৃতই বলতে হবে। ভুবনেশ্বর থেকে ফিরেই ওর মনে হোল, ওর কিছু সময় হাতে থাকা দরকার। মা-বাবাকে সঙ্গ দেওয়া ত আছেই। তাছাড়া, মিঃ মল্লিক রয়েছে, যে চায় তার সঙ্গ। সে নিজেও কি চায় না ? প্রথমেই নাচের ক্লাসটা দিল কেটে। কটা সন্ধ্যে বাঁচল। কি হবে নাচ শিখে ? রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যে বেশ নাম হচ্ছে, তাই থাক। সপ্তাহে ছুটির দিন ছাড়াও মন চায় শম্ভুনাথেরর সঙ্গে গল্প করে কাটাতে।

আবার ভাবে, এ কিছু নয়। নিছক বন্ধুত্ব। আমার মনে হয়, সে নিজের সঙ্গে মিথ্যে অভিনয় করছে না ত ? বাইরে থেকে এসে ক'দিন সে পড়েছিল ডঃ গাঙ্গুলীর বোনটাকে নিয়ে। প্রথম যে দিন সে ডঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে যায়, বোনটা সরে সরে থাকতে চেষ্টা করেছে। আস্তে আস্তে উর্মিলা ওকে হাত করে ফেলেছে গানে গল্পে। মেয়েটা যেন এক নূতন আস্বাদ্ পেয়েছে। উর্মিদিকে তার বড় পছন্দ। ওর কথায় ও গান শিখতে আরম্ভ করেছে। বাড়ীতেই অবশ্য। উর্মিরই একটা চেনা মেয়েকে সেখানে দিয়েছে।

"আপনি কি জাদু জানেন, ডঃ রায় ? আমার বোনটিকে, মনে হয়,

আপনি কেড়ে নিলেন."—হেসে তৃপ্তির সঙ্গে গাঙ্গুলী বলেছে।

হাল্কা ছন্দে উর্মিও দিয়েছে উত্তর, "আপনার কাছ থেকে আপনার বোনটিকে কেড়ে নেবার মন্ত্র, আমার কেন, সারা দুনিয়ার কারও জানা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

যত দিন যাচ্ছে, উর্মি বেশ বুঝতে পারছে, ভাল লাগা ও ভালবাসার পার্থক্য। বসে বসে যখন ভাবে, ওর অবাক লাগে।

প্রথম দু'জনকেই ভাল লাগত ভাল লাগার পর্যায়ে তফাৎ বড় একটা বোধ করেনি। কখনও কোন কারণে একে, কখনও কোন কারণে ওকে বেশী ভাল লাগত। এটা ঠিক, আর সব চেনা লোকেব চাইতে এরা দু'জনেই তার মনের মধ্যে এসেছিল এগিয়ে।

তবে কি ভুবনেশ্বরই এই জাদুটা করল? ক'দিন সে ইচ্ছে করেই মল্লিকের সান্নিধ্য থেকে গা ঢাকা দিল। নিজেকে বিশেষ করে চিনবার জন্য। ডঃ গাঙ্গুলার বোনকে গিয়ে গান শেখাল। ওদের নেমন্তন্ন করল বাড়ীতে। ভাবতে চেষ্টা করল গাঙ্গুলীকে কত ভাল লাগে তার। সব হোল ব্যর্থ। শম্ভুনাথের কথাই মনে আসে। ওর জন্যই মন কেমন করে। ঠিক সেই সময় শম্ভুনাথকে কাজে তিন চার মাসের জন্য মাদ্রাজে যেতে হল।

"এবারও কি একই আদেশ বহাল থাকবে, দেবী? পত্রালাপ নিষিদ্ধ?" জিজ্ঞাসা করেছিল শম্ভুনাথ।

"একই মানুষের কাছ থেকে একই উত্তরই ত স্বাভাবিক।"

"তা ঠিক," মল্লিক বলেছিল।

মনে মনে শম্ভুনাথ বুঝতে পারছিল, উর্মির নিজের ওপরে চলছে পরীক্ষা। এই বিশ্বাস তার হয়েছিল, উর্মি শেষ পর্যন্ত এই মানসিক দ্বন্দ্বের ওপর উঠতে পারবে, চিনতে পারবে নিজেকে। তখনই হবে এই বিচ্ছেদের শেষ।

উর্মিলা মনে মনে ঠিক করেছিল, এই চার মাসে তার সংশয়ের হবে অবসান। তারপরে হবে তার জীবনের নূতন অধ্যায়ের শুরু। মায়াদেবী কিছুটা বুঝতে পারছিলেন মেয়ের মনের অবস্থা। তাই

এবিষয়ে কোন কথা কোন দিন বলতেন না। স্বামীকেও বারণ করেছিলেন।

"সে যুগের উর্মিলা এ নয় যে তার স্বামী যখন তাকে একলা রেখে রাম-সীতার সঙ্গে চলে গিয়েছিল সে মুখ বুজে সব সহ্য করেছিল। স্বামার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা, শুধু কষ্টটা তার নিজস্ব। সেখানে কোন ভাগাভাগি নেই। এখনকার উর্মিলা, যাকে ভালবাসে, তাকেও যেমন ঠকাতে চায় না, চায় না নিজেকেও ঠকাতে," বলেছিলেন মায়াদেবী।

শম্ভুনাথের অনুপস্থিতিতে বুঝিতে পারছিল সে সত্যই ভালবাসে শম্ভুনাথকে। অনেক চিন্তার পরে মনস্থির সে করে ফেলল ওকেই সে নেবে সাথী করে। মা-বাবাকেও ভালবাসে। তাদেরও ছাড়তে হবে না। একবার ভাবলে, মল্লিকে সব খুলে বলবে নাকি? না থাক। শম্ভুনাথ আসুক। সব ঠিক করে তবেই সে বলবে সবাইকে।

এর মধ্যে ডঃ গাঙ্গুলী ও উর্মি মিটিং এর জন্য গিয়েছিল দিল্লী। পথে নেমে, যে ছেলেটাকে, যাকে অনেকদিন আগে শ'পাঁচেক টাকা যোগাড় করে দিয়েছিল তাকে দেখতে গিয়েছিল। ছেলেটা কথা রেখেছে। বেশ সুন্দর গড়ে তুলেছে ব্যবসা। পানের দোকান দিয়ে করেছিল শুরু। এখনও তাই আছে। তবে বড় হয়েছে। বেশী রোজগার করছে। সে পাশ করা বলে লোকে আরও বেশী ভীড় করে আসে। মাও তাকে সাহায্য করে। বোনটা স্কুলে পড়ে। অবসর সময়ে টিউশানিও করে। বড় ভাল লেগেছিল।

এবার নিজের ঠিকানা দিয়ে এসেছে। কলকাতায় এসেই হাজার দু'য়েক টাকা ইন্দ্রজিৎ ও মল্লির কাছ থেকে নিয়ে দিয়েছিল পাঠিয়ে।

"তোরা ত কত জায়গাতে দান করিস। এটা একটু অন্য ধরনের বেকারত্ব ঘুচোবার জন্য দান।"

দেখতে দেখতে ফাল্গুনের ঝরা পাতার মত মাসগুলো এক এক করে গেল ঝরে। হঠাৎ একদিন মল্লিকের বেয়ারা এসে হাজির হোল।

"কালকে সাহেব দমদমে এসে পৌঁছাবেন মাদ্রাজ থেকে। ওনার ইচ্ছা, রাতে যদি আপনারা কোথাও না গিয়ে সাহেবের সঙ্গে খান।

অবশ্য যদি সম্ভব হয়। বাইরে খাবেন মনে হোল। রাঁধতে বারণ করেছেন। এসেই ফোন করবেন, বললেন।"

বেয়ারা গেল চলে।

মায়াদেবী খুশীর চোটে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওগো, শুনছ। আমাদের শম্ভুনাথ কাল আসছে।"

পাশের ঘর থেকে ব্রজেনবাবু এলেন। উর্মিলা তাকিয়ে দেখল— বড় খুশী দু'জনে। ওর মনে হোল, ওরা যেন বড় ছেলের শূন্য স্থানটা পরিপূর্ণভাবে শূন্য রেখে চলতে পারছেন না। তাই বুঝি এই ব্যাকুলতা।

তারও বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করতে লাগল। বেশী আনন্দে এমনটা হয়, এতদিনে বুঝল।

"কিরে, উর্মি? তুই যে চুপচাপ করে রইলি?"—মায়াদেবী চাইলেন ওর দিকে।

"বেশ কথা, যা হোক্। আমি কি নাচব?"

"নাচতে তোকে কে বলছে আবার? হাসবি তো।"

উর্মি বুঝতে পেরেছিল, তার মনের ভেতরের চঞ্চলতাকে ঢাকতে গিয়ে ও অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। তাই স্বাভাবিক পরিবেশ করবার জন্য বলল, "না, মানে পেটটা যেন কেমন করল।"

"সে কি কথা? কি ওষুধ দেব তোকে, বলত?"

হঠাৎ কিছু হলে দেবার মত ওষুধ মজুত থাকে। ডাক্তার ত ঠাট্টা করে মায়াদেবীকে বলেন,—"আপনি ত হাফ-ডাক্তার।"

"না, না। কিছু দিতে হবে না। একটা ঠাণ্ডা কোক্ খাচ্ছি, তাতেই ঠিক হয়ে যাবে। মল্লিক আসছে, ভালই হোল। তাই না?" উর্মি থামল।

"ভালই হোল মানে? খুব ভাল হোল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসছে।"

বাবার কথা শুনে হঠাৎ দাদার কথা মনে পড়ে গেল। আজ ঘরের ছেলে কোথায়?

"যা না মা তুই দমদমে, ওকে আন্তে। ও কলকাতাতে থাকলে ত যায় তোকে আনতে হাওড়া স্টেশনে," মা বলল।

"তা বটে। কিন্তু ও যায় নিজের গাড়ীতে।"

"মল্লির কাছ থেকে গাড়ী চেয়ে নে।"

"কি যে বল মা। তারপর মেসো ত পিছনে লেগে আর তিষ্ঠোতে দেবে না।"

মায়াদেবী হাসলেন, "সে কথা ঠিক। কাল ত আবার তোর মেসো সকালে আসছে। সারা সকাল কাটিয়ে দুপুরে খেয়ে বাড়ী যাবে। তুই বরঞ্চ বেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়িস্ ট্যাক্সি নিয়ে দমদমের পথে।"

উর্মিলার খুব ইচ্ছে কর্'ছিল যেতে। "তা না হয় হোল! তোমরাও কিন্তু কিছু বলতে পাবে না।"

"তাই হবে রে পাগলী, তাই হবে। একেবারে স্পিক্‌টি নট্," ব্রজেনবাবু বলে উঠলেন।

আঠার

উর্মি কলেজ থেকে একটা দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল। অন্ধকার থাকতে উঠে প্রস্তুত হয়ে ট্যাক্‌সি করে সোজা চলে গেল দমদমে। বড় ভাল লাগছিল তার, বারে বারে মনে হ'চ্ছিল, কত ভাগ্যবতী সে। যাকে ভালবাসে সে, স্বার্থপরের মত শুধু তাকে যে তাকে ভালবাসে, তা নয়। তার মা-বাবাকেও ভালবেসে মন জয় করে নিয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, শম্ভুনাথের ভালবাসার মধ্যে খাদ নেই।

যাবা তাকে এনেছে এই জগতে, দুঃখে, কষ্টে, স্নেহে, মমতায়, নিজেদের দিকে না তাকিয়ে বড় করে তুলেছে, তাদের হেলা-ফেলা করে যদি শুধু বলত, "তোমাকেই ভালবেসেছি আমি, তবে তার মধ্যে থাকত না অন্তরের স্পর্শ। সে যে বোঝে, মা-বাবা তাকে বড় করে না তুললে, কোথায় পেত তাকে? সে ত নিজে হেঁটে আসেনি এই পৃথিবীতে। সে

ত আকাশ থেকে বড় হয়ে ঝুপ্ করে পড়েনি।" আজকে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে কত কথাই মনে হচ্ছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, সব কোন না-জানা পথ ধরে প্রবেশ করেছে এই পৃথিবীতে। তারা জন্মেছে পূর্ণ যৌবন নিয়ে। কারো কাছে তাদের কোনও দেনা নেই, পাওনা নেই, তাই দেবারও কিছু নেই। দায়িত্ব নেই কারো প্রতি। না বাবা-মা, না সমাজের প্রতি, না দেশের প্রতি।

এয়ারপোর্টে বুঝি একটু আগেই এসে পড়েছিল। এ তার চিরকালের স্বভাব। বয়স হলেও কি এক মাথা সাদা চুল নিয়ে এই রকম সাত তাড়াতাড়ি সে পৌঁছে যাবে স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে? বোধ হয়, যাবে না। ক্ত দিনে নানা ধরনের মানুষ দেখা তার শেষ হবে। না, না। তাকি কখনও হতে পারে?

এ দেখার শেষ নেই, জানবার শেষ নেই।

কানে এলো—'মাদ্রাজের' প্লেন দু-এক মিনিটের মধ্যে নামবে' —ঘোষণা শেষ হোল। ঊর্মিলা গিয়ে দাঁড়াল যেখান দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা ঢুকবে, সেইখানে।

বেশ একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। শান্ত পরিবেশটা গেল লণ্ডভণ্ড হয়ে। তার মত যারা এসেছিল চুপটি করে, তারা ধরল অন্য মূর্তি। হঠাৎ দূর থেকে নজরে পড়ল শম্ভুনাথকে। কারো ত আসার কথা নয়। তাই সোজাই সে এ্যাটাচি হাতে এলো বেরিয়ে। কোন দিকে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একপাশে দাঁড়িয়ে চুপ্টি করে ঊর্মিলা দেখছিল। বেশ মজা লাগছিল ওর। হঠাৎ ভয় হোল, ওকে ফেলেই বুঝি ও এগিয়ে চলে যাবে।

"এই-ই? কি আশ্চর্য! কানা, অন্ধ নাকি? কিছু দেখতে পায় না?"

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শম্ভুনাথ এ যে ঊর্মিলার স্বর, যার কথা সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে। ফ্ল্যাটে পৌঁছেই ফোন করবে। কে জানে, ও যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে, সে কিনা সশরীরে এখানে চোখের সামনে, হাতের নাগালে। ওর যেন কেমন কথা বন্ধ হয়ে গেল।

ততক্ষণে উর্মিলা এগিয়ে এসে হাতটা ধরেছে, "বেশ যা হোক্। আমাকে ফেলেই চলে যাওয়ার মতলব?"

"তোমাকে এখানে পাবো, ভাবতে পারিনি যে," বলেই কেমন যেন হয়ে গেল।

"না, মানে আপনাকে আশা করিনি।"

"ঠিক করেছ, এখন থেকে আমি উর্মি, তুমি শম্ভু। আর আপনিটাকে প্লেনে তুলে দেওয়া যাক্। কি?"

অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল মল্লিক। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

"কি হোল? বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে। ট্যাক্সিতে চড়ে সব বলব। চল, টিকিট দেখিয়ে তোমার ব্যাগটা উদ্ধার করা যাক।"

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে উর্মি বলে চলল তার মনের কথা। এতদিনের বাঁধ গেছে টুটে। কত ভাবে এই ভালবাসার বন্যাকে সে রুখে রেখেছিল মনের নানা রকম নুড়ি-পাথর দিয়ে। সব গেল একাকার হয়ে। সে বলে চলেছে,—"আজ আমি সব কথা এক এক করে তোমার কাছে বলব। কোন কথা লুকাবো না। বেশ বুঝতে পেরেছি, আমাদের এই দুটি জীবন এক অদৃশ্য সুতোতে বাঁধা। তার থেকে সরে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমার মনের মধ্যে এই বার্তা কে যে বারে বারে পৌঁছে দিচ্ছে। কতবার ত চেষ্টা করেছি সরে যেতে। মনকে বোঝাতে, এ কিছু নয় ত, বাইরের আকর্ষণ। পারলাম কোথায় সরে যেতে। নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি। এখন আমি পরাস্ত। তোমাকে সব বললাম। মেনে নিলাম ভবিতব্যকে—তবে তাই হোক্। আমি জানি তুমি এসেছ আমার কাছে সহজভাবে, মনে প্রাণে। মনের ভুলে নয়। তোমাকেও দুঃখ দিয়েছি। আজ থেকে এই সংশয়ের অবসান। এস, তুমি আমার জীবনে, শম্ভু।"

ধীরে ধীরে কাঁধের উপর মাথাটা রাখল উর্মি। মনে হোল, এত বছরের মনের সংশয় শেষ হওয়াতে বড় শান্তি পেল।

"জান উর্মিলা, কত বছর ধরে তোমাকে পাবার তপস্যায় ছিলাম

মগ্ন। তার অবসান হোল," আস্তে আস্তে একটা হাত দিয়ে উর্মিকে জড়িয়ে ধরল শম্ভুনাথ।

দু'জনে এসে হাজির হোল শম্ভুনাথের ফ্ল্যাটে। কেন জানি, বেয়ারার মনে হয়েছিল তাদের ভবিষ্যৎ মেমসাহেবের সঙ্গে দুপুরে তাদের কাছে যাবে। ভেবেছিল মনে মনে, তাই দু'জনের মতই রান্না করেছিল।

চোখের সামনে দু'জনকে একসঙ্গে নামতে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল ভাবলেই কি তা হবে? তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

খেতে বসে অবাক হয়ে উর্মি শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা, তুমি কি বলেছিলে, আমিও খাব?"

"মহারাণীর হুকুম ছাড়া আমি কি বলতে পারি?"

"আশ্চর্য! মনে হচ্ছে ওরা পুরোপুরি দু'জনের জন্য করেছে।"

হেসে মল্লিক বলল, "ওরাও ত মানুষ। বেচারা সাহেবের তপস্যা সার্থক হোক্, বা নিশ্চয়ই হবে, সেই ভেবেই বোধ হয়।"

"থাক, থাক। খুব হয়েছে। শুনতে পাবে।"

খেয়ে উঠে সোফাতে বসে কত কথা হচ্ছিল। এখন আর দূরত্ব বজায় রাখার দিকে কারও খেয়াল নেই। মল্লিকের একটা হাত আস্তে করে কাছে টেনে নিয়েছে উর্মিকে।

"কি ব্যাপার বলত বেয়ারা, সাহেবকে ত কখনও এভাবে দেখিনি।"

"একের নম্বর বোকা। সেদিকে মোটে যাসনি, যদি চাকরি রাখতে চাস। বলিনি আমি গতবছর, ইনিই আমাদের ভবিষ্যৎ মেমসাহেব। নে এখন বাজি ধর।"

"আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু ততটা নই। এখন বাজি ধরে ঠকে যাই। এখন ত সব খোলসা। এখন বলি, তুই বোকা। গত বছর বাজি ধরলে"

"ঠিক বলেছিস্। যাক্‌গে। এই মেমসাহেব, মনে হয় ভালই হবে। কলেজে পড়ায়। কাজ নিশ্চয়ই ছাড়বে না।"

"তাত হোল। তেনার মা-বাবা—তারাও আসবে নাকি?"

"ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস্। সুযোগ বুঝে তাদের কথা জিজ্ঞেস্ করতে হবে।"

"উর্মি, তুমি একবার বাড়ীতে ফোন করলে না?"

"ইচ্ছে করেই করিনি। এখন করব। মেসোর থাকার কথা। আর শোন, আমাদের কথা এখন শুধু আমরাই জানলাম। নিজেদের মধ্যেই শুধু আমরা তুমি বলব। ধীরে সুস্থে, সময় ও সুযোগ মত হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব।"

"উর্মি, তোমার এই উদাহরণটা কিন্তু মোটেই আমার ভাল লাগল না।"

"ভাল না লাগারই ত কথা। এত দিনই যখন তপস্যা করেছ তখন তার রেশটা আরও কিছু মাস টেনে চল।"

"তা আর আমি পারব না।" আর একটু কাছে টেনে নিল উর্মিকে শম্ভুনাথ। উর্মিলার দিক থেকে কোন আপত্তি দেখা গেল না।

"শোন উর্মি, পার্বতীর তপস্যায় শিবের তপস্যা হয়েছিল ভঙ্গ। তারপরে কিন্তু কোথাও লেখা নেই অপেক্ষার কথা।"

হেসে উর্মি বলল, "তা ঠিকই। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ মশাই, সে ছিল সত্য যুগের কথা। আর এটা হচ্ছে ঘোর কলি যুগ। তাই শুরুতেই গেছে উল্টে। মহাদেবকে করতে হয়েছে তপস্যা। তাই শেষটাও হবে অন্য রকম।"

"শোন উর্মি, কথার মার-প্যাঁচ রাখ। তোমার কথা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। বাইরে অন্যভাবে চলতে হবে। দিল্লি দূর অস্ত খুলেই বলনা সব। মল্লিকাদেবীর মত কি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে? জেনো, আমি সবেতেই রাজি। শুধু হাত-জোড় করে বলতে চাই, আর তপস্যা করতে বোল না।"

হেসে ফেলল উর্মিলা, "দোটানার মধ্যে এতদিন কাটাতে পেরেছ, আর জানার পরে আরোও কটা মাস চলতে পারো না? পারতে হবে। আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।"

"না বাবা, চটে দরকার নেই। তথাস্তু।"

মল্লিক ওর হাতে উপরে নিজের ঠোঁট দুটি রাখল।

"এই ত লক্ষ্মী ছেলে। আর একটা কথা শোন—মল্লিকার মত একই ধরনের দায় আমার নেই। ওর কোন ভাই নেই। মেসে হয়েও তুই ও বাড়ীর উপযুক্ত ছেলে। তাই সে তার বাবা মার পদবী রাখার দায়িত্ব নিয়েছে। আমার জলজ্যান্ত দুটি ভাই রয়েছে। দাদা যখন পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেল, তখন এই সামান্য দায়টুকু করুক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে পদবীর কল্যাণে মনে করতে হবে কোথা থেকে এসেছে। অনুপ ভালই। পরে কি হবে জানি না। থাক চেপে এই দায়িত্বটা ওর ঘাড়ে। আমি নেব মা-বাবাকে। সেখানে কেউ ভাগ বাসাতে পারবে না।"

"বেশ ত। সে ত আমারও ভাগ্য। তোমাদের তিনজনকে দেখে কত সময় হিংসে হয়েছে। বলিনি কিছু। মনে হয়েছে, এমন ভাগ্য কি হবে, তোমাদের মধ্যে তোমাদের আপন হয়ে আমিও থাকব। এখন পর্যন্ত আমি ত কেউ নই। তা সত্ত্বেও ওঁরা আমাকে কত ভালবাসেন। মনে হয়, আগের জন্মে আমি বুঝি ওঁদের ঘরেই জন্মেছিলাম।"

গম্ভীর ভাবে ঊর্মিলা বলল, 'হবেও বা। আর এ জন্মের সন্তান আগের জন্মের শত্রু।"

গলার স্বরে দুঃখের ছোঁয়া বুঝতে পেরে শম্ভুনাথ তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘোরাল। আজকের মত দিনে ঊর্মির মনে দুঃখের সুর ও শুনতে চায় না।

"আগে বাবা, তুমি বাড়ীতে ফোন কর। আদরের দুলালীর কাছ থেকে খবর না পেয়ে কত জানি দু'জনে ছটফট করছে।"

"ঠিক বলেছ," লাফিয়ে উঠল ঊর্মিলা।

"কে? মা? মেসো চলে গেছে? বাঁচা গেল। শোন, আমরা দু'জনে টিভোলী কোর্টে দুপুরে খেয়েছি। রাতে আমাদের চারজনের এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। একটু পরে আসছি। বাইরে চারজনে চা খেয়ে একটু বেড়ান যাবে। ভাল আছি। রাখলাম।"

শম্ভুনাথের বড় ভাল লাগল। উর্মিলা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে গৃহিণীর দায়। নিজেই রাতের খাবার ব্যবস্থা করল। কবে সেদিন আসবে, যেদিন সত্যিকারের সব ভার নিয়ে এসে দাঁড়াবে ওর পাশে।

আড়াল থেকে বুদ্ধিমান বেয়ারা ফোনের কথাগুলো শুনছিল। যেন কিছু জানে না, সেই ভাব করে বেরিয়ে এসে সোজাসুজি উর্মিকেই চায়ে কি দেবে জিজ্ঞাসা করল।

"না. চা আমরা বাইরে খাব। রাতে আমরা আর আমার মা-বাবা এখানে খাবে। তুমি ত বেশ রাঁধ। নিজে বুদ্ধি করে সব কোর।"

"তাই হবে। ওঁনারা কেমন আছেন?"

"ভালই আছেন-হেসে উর্মিলা বলল।"

সেদিন ওরা খুব বেড়িয়ে বাইরে চা খেয়ে রাতে ফিরে আসল এই ফ্ল্যাটে। সামনে অবশ্য ওরা কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না। তবুও মায়াদেবীর কেমন জানি মনে হচ্ছিল, একটা বড় রকমের পরিবর্তন হয়ে গেছে—সুখের, আনন্দের। সোজাসুজি কোন আভাস নেই তার, তবুও যেন আবছা আবছা রেখা এদিক সেদিক ফুটে উঠছে।

"দু'জনকেই খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে. তাই না?"

"তাত সব সময়ই দেখায়। দু'জনেই দু'জনের সঙ্গ পছন্দ করে।"

"শুধু কি তাই? আরো যেন কিছু মনে হচ্ছে," মায়াদেবী বললেন।

"কি যে বল, বুঝি না। ওদের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। থামবে ত।"

ওদের দিনগুলো যেন পাখীর ডানার ওপর ভর করে উড়ে উড়ে যেতে লাগল। মায়াদেবী কিসের যেন আভাস পাচ্ছিলেন; তাই স্বামীকে নিয়ে নানা অছিলায় ওদের থেকে সরে থাকছিলেন। আজ মল্লিদের ওখানে যাওয়া কাল বাণীর কাছে, পরশু ব্রীজ খেলা। উর্মি আর শম্ভু নিজেদের মধ্যে এতটা ডুবে ছিল যে, এই সব ছলনা ধরতে পারেনি। স্বাভাবিক অবস্থা হলে কবেই বুঝতে পারত।

আজ যে ওদের মনে ধরিত্রীর মত সময় অসময়ে রং বদলাবার

পালা। শতবর্ণের ভাব, উচ্ছ্বাস তাদের মন প্রাণকে করছে উদ্বেলিত ;
এ ত শুধু দেহের আকুলতা নয়, এ যে মনের ব্যাকুলতা।

এর ত কোন শেষ নেই। এ ত দেহের উচ্ছ্বাসের মত যা, ঢেউয়ের মত উঠে উঠে তার পর শেষ হয়ে যায়। রেখে যায় শুধু ক্লান্তি। এ যে মনের সঙ্গে মনের কোলাকুলি। ধীরে ধীরে বেড়ে চলে। তার কোন সীমারেখা নেই। এনে দেয় শান্তি, আনন্দ, সুখ। ওরা ভাবে, এ কোন অজানা, সুদূর সাগরের পাড় হতে এসে বাসা বাঁধল তাদের মনে।

"আমি কেন এত দিন বুঝিনি, শম্ভু, আমি যা চেয়েছি, তুমি তাই। আমি যা চাই, তুমি তাই। এতদিন বসে বসে বিচার করে কত বছর দিলাম চলে যেতে ?"

"এটাই ত ভাল হোল, উর্মি' প্রথম জীবনে হল এর অবসান। পথের জন্য রইল না অবসাদ।"

"তা বোধ হয়, ঠিকই বলেছ, শম্ভু।"

দু'জনে লেকের পাড়ে এক নির্জন কোণে বসে রইল চুপ করে। এইভাবে ওরা প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা কাটাল একান্তে। সারা জীবনের নানা কথা, নানা ঘটনা একজন আর একজনকে বলে উজাড় করে। উর্মি বলে তার আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। পরে ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে আসা।

"উর্মি, আমি তোমার সে বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ। এই মণিহার ভুল করে সে ফেলে না গেলে তা যে আমি পেতাম না।"

উর্মিলার মনে হল, শম্ভু সত্যি তাকে ভালবাসে। তাই ত বিগত ঘটনা তার মনে আনেনি হিংসা।

নিজের কথা ভেবেও তার কেমন অবাক লাগে। অনেকের কাছেই শুনেছে, মৃত সতীনকে কত হিংসা করে মেয়েরা। আশ্চর্য তার কিন্তু শম্ভুর স্ত্রীর কথা ভাবলে দুঃখ হয়। এমন স্বামী ফেলে চলে যেতে হল তাকে।

একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হ্রদের ধারে বসে শম্ভু বলল, "আমাদের কি এখানে-সেখানে দেখা করেই দিন কাটাতে হবে ? অনেক

বৎসর কেটেছে আমার পরীক্ষা দিতে দিতে। জীবনের সব চাইতে বড় পরীক্ষাতে পাশ করা সম্ভব হবে কিনা। একই আস্তানায় কি আমাদের ঠাঁই জুটবে না?"

উর্মিলা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মল্লিকের দিকে, "অমন করে কেন বলছ? অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে যখন আমরা এসে পৌঁছেছি, তখন এ কথা কেন বলছ?"

"ভাবছিলাম, তোমার অনুমতি নিয়ে বাবা-মাকে জানাব, তাই," শম্ভুনাথ থেমে গেল।

"ঠিকই বলেছ। সময় এসেছে। হঠাৎ আজ সকালে চিঠি পেলাম অনুপের। ওরা আসছে কাল এসে পৌঁছাচ্ছে।"

"একটু হঠাৎ যেন?"

"ঠিক তাই। আমারও মনে হচ্ছে। বাবা-মা, অনুপের স্ত্রী, বনানীর মা, বাণীমাসীও খুব খুশী। তিনিও পেয়েছেন চিঠি। মা-বাবার মন। আমাদের তিনজনের মানে ইন্দ্রজিৎ, মল্লি আর আমার যেন কেমন একটা খট্‌কা লাগছে মনে। হতে পারে, কিছুই না। শুধু ছুটি কাটাতে আসছে।"

শম্ভুনাথের মনেও যেন কেমন কেমন লাগছিল। কিছু না বলে দু'জনে উঠে পড়ল। আসছে কালই সব জানা যাবে।

মল্লির গাড়ী করে ব্রজেনবাবু স্ত্রীও বাণীদেবীকে নিয়ে গেলেন স্টেশনে। বাণীদেবী একা থাকেন, তাই ব্রজেনবাবু বলেছিলেন, "বাণী, তোমার বাড়ী ঠিক করে রাখ। তোমার কাছেই ওরা ছেলে নিয়ে উঠুক। প্রথম, বড় একা থাক তুমি। আমাদের কাছে ত তাও উর্মি আছে।"

বাণীদেবীর চোখে জল ভরে এসেছিল। সত্যিই, এক এক সময় বড় একা বোধ হয়। আপনজনের ভার অভাব নেই, কিন্তু বাড়ীর মধ্যের শূন্যতা ত পূর্ণ হয় না। বড় ছেলে দিল্লি, ছোট ছেলে ক্যানাডা, মেয়ে লক্ষ্ণৌ। সেদিন সবাই প্রথম এসেছিল উর্মিদের ওখানে। ইচ্ছে করেই শম্ভুনাথকে আসতে বারণ করেছিল। রাতের খাবার পর বাণীদেবী, মেয়ে-জামাই, নাতি নিয়ে বাড়ীতে চলে গেলেন।

ত্ব'চার দিন প্রথমে বেশ হৈ-চৈ করে কাটল। খাওয়াটা একসঙ্গেই সকলের হচ্ছিল, বিশেষ করে রাতের পর্ব। কখনো উর্মিদের ওখানে, কখনো বাণীদেবীর ডেরায়। এভাবে ক'দিন কাটার পরে উর্মির মনে হল, এবার বোধ হয় ওরা সবার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে। এই কথাই শম্ভুনাথকে বলছিল আর মনে মনে আশা করছিল, ত্ব'একটা দিনের মধ্যেই শম্ভুকে বলবে মা বাবাকে তাদের কথা জানাতে।

সেদিন শনিবার। সবাই সারা দিনের জন্য জুটেছে মল্লিদের ওখানে। শম্ভুনাথও আছে। সবাই যখন গল্পে মশগুল, অনুপ ডেকে নিল উর্মিকে পাশের ঘরে একান্তে।

উনিশ

"উর্মি, তোকে যে আমার একটা কথা বলার আছে। এসে পর্যন্ত বলব, বলব করেও ঠিক বলে উঠতে পারছি না। তাই তোকেই বলব ঠিক করেছি। তুই বুঝবি ব্যাপারটা।"

উর্মির বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। ওর বলার ভঙ্গিটা মোটেই সুবিধার লাগল না। কে জানে, কি বলতে চায়। মা-বাবা তাতে ব্যথা পাবে না ত? ও চুপ করে রইল।

"অস্ট্রেলিয়াতে বছর পাঁচেকের জন্য যাবার একটা সুযোগ আসছে। গভর্নমেণ্ট থেকেই পাঠাবে। অনেকটা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। এত বড় সুযোগ আর জীবনে পাব না। তাই," অনুপ থামল।

উর্মিলার মুখে কোন কথা যেন যোগাল না। দাদা চিরকালের মত বিদেশবাসী হয়েছে। সেই দুঃখে মা-বাবার মন ও স্বাস্থ্য, দুই ভাঙ্গা। অনুপও যদি······।

ও যেন আর্তনাদ করে উঠল, "তা কি করে হয়, অনুপ? তুই এ কথা কি করে ভাবছিস্? দাদা······।"

বাধা দিয়ে অনুপ বলে উঠল, "দাদার কথা ছেড়ে দে। আমরা ত কয়েকটা বছর পরেই ফিরে আসব। তাছাড়া, এমন সুযোগ ত ছাড়তে

পারি না। তোর সেটা বুঝতে হবে, আর ওদের বোঝাতে হবে। দরকার তেমন হলেই ত আমি ছুটে আসব। তাছাড়া তুই আছিস্। মল্লি, ইন্দ্রজিৎ আছে। মা-বাবার দিকে তাকিয়ে ত সব কিছু ছাড়া যায় না।"

অনুপের শেষের কথা থেকে উর্মিলা বেশ বুঝতে পারল, মা-বাবার জন্য আবও একটা শেল আসছে। অনুপ তার সঙ্কল্প থেকে এতটুকু নড়বে না। সে শুধু ভাবতে লাগল, এই আঘাতটা কি ভাবে কিছুটা সহনীয় করা যায়।

"অনুপ, আমার ছোট একটা কথা রাখ্। আসছে দু'দিন কিছু বলিস্ না।"

"বেশ," অনুপ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উর্মিলা এতেই কৃতার্থ বোধ করল। দুটো দিন ত ওরা আনন্দ করুক। একটু পরে উর্মি বেরিয়ে এলো। স্বাভাবিক উর্মি, হাসিখুশি উর্মি। খাবার আগে মল্লিকে বলে সবার অজান্তে শম্ভুকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। অনেক কথা বলতে হবে ওকে। দু'দিন মাত্র তার সময়।

"কি ব্যাপার, বলত? হঠাৎ দু'জনে একলা হাঁটার কথা কেন তোমার মনে হল। সবাই কিছু মনে করবে না ত?"

"করলেই বা, দু'দিন পরে।"

বাধা দিয়ে শম্ভু বলে উঠল, "না না, সে ভাবে বলছি না।"

"তুমি ত ক'দিন থেকেই আমাদের বিয়ের কথাটা বাবাকে বলবে বলবে করছিলে।"

"সত্যি উর্মি, আমার আর দেরী করতে মোটেই ইচ্ছে নেই। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। আমার 'বস'কে জানিয়েছি, আর এর চাইতে বড় ফ্ল্যাটের জন্য দরখাস্ত করেছি। বিয়ের পরে আমি বড় ফ্ল্যাট পেতে পারি।"

"কেন? এটা কি দোষ করল?"

"দোষ কিছু করেনি। একটু ছোট হবে, এই যা। মানে, আমি ঠিক করেছি মা-বাবাকে আমাদের কাছেই রাখব। মানে, যখন মনে

করবেন, এখানে সেখানে যাবেন। জান, আমার মা-বাবার মনের দিকে না তাকিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলাম। সে দুঃখটা আমার আছে। তাই, এই আমার আকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া, আমি জানি, তোমারও এতে মত হবে। একদিন তুমি বলেছিলে—'পদবীর বোঝাটা দুই ছেলে বয়ে বেড়াক, আমি নেব মা-বাবাকে। সেখানে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না।' অনেকদিন থেকেই তোমার মা-বাবাকে বড় আপন মনে হয়। তাই, আমার এই ইচ্ছাকে তুমি পূরণ করবার ভার নাও। ওঁদের বলো বুঝিয়ে। দেখো, এ থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।"

অনুপের কথাটা শোনার পর থেকে মনটা হয়ে উঠেছিল চঞ্চল। শম্ভুনাথ যেন তার উপর শান্তিজল দিল ছিটিয়ে।

"শম্ভু, তুমি যা বললে, তাই হবে। তোমাকে একটা কথা বলব বলে বেরিয়ে এসেছি। অনুপরা অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে। বছর পাঁচেকের জন্য। আজকে এই একটু আগে আমাকে বলল।"

"সে কি! তোমার বাবা-মা যে বড় আঘাত পাবেন এ কথা শুনে।"

"আমি বলেছি, আসছে দু'দিন ওরা আনন্দে থাকুক তার পরে তুই বলিস।"

"ভাল করেছ। ঠিক করেছ। কালকেই আমি বা আমরা আমাদের কথা ওঁদের বলব। আর আমার অনুরোধও জানাব। তুমি আমার সহায় হবে আমি জানি। ওঁরা আমাকে কত ভালবেসে ফেলেছেন। আমি তা খুব অনুভব করি।"

"তুমি ঠিক বুদ্ধির কথাই বলেছ। ওঁরা তোমাকে, মনে হয়, তাঁদের বড় সন্তানের জায়গাতেই প্রায় বসিয়েছেন। এই সুখবরের পরে আঘাতটা, মনে হয়, সইতে পারবেন।"

এতদিন পরে শম্ভুনাথ এগিয়ে এসে ঊর্মিকে কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটের উপরে ঠোঁট রাখে।

রাতে শুয়ে শুয়ে বাণী মাসীর কথা মনে হল। ও বেচারা বড় একা। মল্লিকে বলতে হবে সব কথা। ওই পারবে তাকে মনে শক্তি

দিতে। সে কি করে পারবে? তার যে মুখ নেই। তারই ভাই নিয়ে যাচ্ছে মাসীর মেয়েকে সুদূর দেশে।

সকালে উঠে ত উর্মির মন ভরে গেল আনন্দে। আজ থেকে তার নূতন জীবনের শুরু, মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে। আইনত না হলেও, ধর্মত। ওঁরাই ত তার চোখের সামনে ভগবানের অংশ। তাই ত হিন্দু শাস্ত্রে লিখেছে ঃ—

জননী জন্মভূমিশ্চ—
স্বর্গাদপি গরিয়সী

আবার অন্যদিকে :—

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম···
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ।

আজকে সবাই আসবে তাদের এখানে রাতে খেতে। অর্ধেক রান্না করছে শম্ভুর বেয়ারা উর্মির হুকুম অনুসারে। অর্ধেক হবে এখানে। দিনটা রবিবার। শম্ভু সকালে চা খেয়ে এসে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে বাজার থেকে বাকি জিনিস আনতে যাবে। বেশীর ভাগই সব আগের দিন কেনা হয়ে গেছে।

শম্ভু এসে দেখল, তাকে আর বাজারে যেতে হবে না। যা আনার ছিল, রবি এনে ফেলেছে। নিজের ফ্ল্যাটে দেখে এসেছে রান্নার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানেও সেই একই দৃশ্য। উর্মি কোমরে আঁচল জড়িয়ে মার সঙ্গে লেগে গেছে।

"এখানেও দেখছি, যুদ্ধং দেহি ভাব।"

"বড় ঠিক বলেছ, বাবা। মায়া যা করছে, আমার ত ভাল লাগছে না।"

"কিছু ভাববেন না। ওকে সরিয়ে আমি কাজে মোতায়েন হচ্ছি।"

"মা, শোন, শোন শম্ভুর কথা।"

"আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আজকের আনন্দের দিনে খেটেখুটে সব শরীর খারাপ হোক্‌। আমি বেয়ারাকে আরও একটা পদ করতে বলে এসেছি। রবি কাজটা নিশ্চয়ই পারবে। কি বল?"

"নিশ্চয়ই পারব।"

"তবে লক্ষ্মী ছেলের মত সবার জন্য নিম্‌কি আর কফি করে নিয়ে এসো।"

একটু হেসে মা-মেয়েতে গেল হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়তে।

শম্ভুনাথের যেন তর সইছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল, 'শুভস্য শীঘ্রম্'। ব্রজেন রায়ের কাছে এসে চেয়ার টেনে বসল। কেমন যেন গলাটা আট্‌কে যাচ্ছে। না, ওরা এসে পড়লে বলাটা তবুও কঠিন হবে।

"বাবা, একটা কথা ছিল।"

ব্রজেন রায় মুখ তুলে তাকালেন। যে কথাটা শুনবার আশায় ওরা দু'জনে দিন গুনছে, সেই কথাই কি বলবে? তাই যেন বলে।

"বাবা, বলছিলাম কি, ঊর্মিকে আমি বিয়ে করতে চাই। ওরও মত আছে,"—শম্ভুনাথ পায়ে হাত দিল।

আনন্দে ব্রজেনবাবু জড়িয়ে ধরলেন শম্ভুকে, "বাবা, এর চাইতে আনন্দের, শান্তির কথা ত আর কিছু হতে পারে না।"

সেদিন রাতে সবার সামনে ব্রজেনবাবু এই শুভ সংবাদটা ভাঙ্গলেন। আনন্দের যেন হাট বসে গেল। ইন্দ্রজিৎ এসে জড়িয়ে ধরল শম্ভুনাথকে।

"তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, আমার বোনকে বিয়ে করবে। এই আশা আমরা মনে মনে করছিলাম। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার হল ডবল সম্বন্ধ।

হৈ চৈ পড়ে গেল। অনুপ চেঁচিয়ে উঠল, "ইন্দ্রজিৎ দা, তার মানে, তুমি বলতে চাও তোমার সঙ্গে আমাদের হচ্ছে সিঙ্গল সম্বন্ধ? সিঙ্গল সুতো দিয়ে বাঁধা। আর শম্ভুনাথের সঙ্গে ডবল সুতোর কারবার। প্রটেস্ট।"

শম্ভুনাথ শুধু হাসছিল আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সপ্রতিভ চঞ্চল ঊর্মির যেন কেমন একটা শান্ত, সলজ্জ ভাব। এই সাময়িক পরিবর্তনে ওকে বড় ভাল লাগছিল। হঠাৎ মনে হল, তারও কি সে ভাব এসেছে নাকি?

মল্লিকার গলা কানে গেল, "দেখ, দেখ, শম্ভুকে লাজুক লাজুক লাগছে না? তার সঙ্গে বোকা বোকা?"

মায়াদেবী বলে উঠলেন, "তোরা একটু থামবি তো? এসো বাবা, তোমরা দু'জনে বড়দের প্রণাম কর।"

উর্মির দিকে তাকিয়ে মল্লির চোখে জল এসে গেল। এই বন্ধুটার চিন্তায় কত রাত ওর ঘুম হয়নি। এত সেন্সিটিভ্ মেয়ে, প্রথম জীবনে বড় রকমের ভুল করে ধাক্কা খেয়ে কেমন যেন পাল্টে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে নিজেকে শক্ত করে, সংযত করে এতটা পথ এগিয়ে এসেছে। কেউ বলতে পারবে না কারও উপর কোন রকম করণীয় থেকে সে পিছিয়ে গেছে।

আজ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার ইন্দ্রজিতের বন্ধু শম্ভুনাথ।

মল্লি গিয়ে উর্মির হাতটা টেনে বলল, "বেশ যা হোক্, তালে আছিস্। আজকেও বিয়ের দিনের কনে সেজে আরাম করে বসবি? সেটি হচ্ছে না। কোমরে আঁচল জড়িয়ে আয়, সকলকে খেতে বসিয়ে দিই।" ওদের পিছনে পিছনে বনানীও চলে গেল।

শম্ভুনাথের বাড়ী থেকে খাবার সময় মত এসে গিয়েছিল। টেবিলের উপর খাবার রাখা হয়েছিল, কিন্তু সকালে ইচ্ছা মত প্লেটে নিয়ে পরিষ্কার মেঝেতে যেখানে সেখানে বসে খেয়েছে। বেশ নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

পরের দিন সকালে অনুপরা থাকতে চলে এলো মায়াদেবীদের কাছে। গতকাল সকালে অনুপ টেলি পেয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন ওরা কর্মস্থলে চলে আসে। তারপর তাদের বিদেশ যাত্রা করতে হবেই। তাই, বিশেষ করে, মা-বাবার সঙ্গে সব বলে যদি উর্মির বিয়েটা এর মধ্যে হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

"উর্মি, টেলিটা পড়ে দেখ্। কিছু কি বলেছিস্?"

"না, তোরই ত বলবার কথা। আজকের দিনটা বাদ দে। কাল বলিস। আজ ত বিকালে ও রাতে তোদের বন্ধুদের ওখানে খাবার কথা। তাই না?"

"তাই। আর একটা কথা হচ্ছে তোদের বিয়েটা, আমরা থাকতে থাকতে হওয়া দরকার। তুই আমার একটা বোন।"

"বেশ, তাই হবে। আমার সেই ইচ্ছা।"

ঊর্মি বেরিয়ে পড়ল, কলেজের উদ্দেশে। আজ ওর মাত্র দুটি পিরিয়ড নিতে হবে। তারপর কথা আছে, সোজা ও যাবে শম্ভুর ফ্ল্যাটে। শম্ভুর ফ্ল্যাটে গিয়েই ও টেলিফোনে মল্লিকে আসতে বলল। দু'জনে বসে অনেক পরামর্শ হল। বিকেলেই শম্ভু, ব্রজেনবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে সব কথা বলবে। বিকালে দু'জনে গিযে হাজির হল। অনুপ, তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গতকালের ধকল যেন এখনও দু'জনে সামলে উঠতে পারে নি। তাই বুঝি বিছানাতে শুয়ে শুয়ে দু'জনে গল্প করছিল। ওরা ভেবেছিল ঊর্মি ও শম্ভু নিশ্চয়ই আজকে নিজেদের মধ্যেই কাটাবে। তাই একটা ফোনের আশা কবছিল। দু'জনকে দেখে অবাকই হল। উঠে বসলেন মায়াদেবী।

"কি ব্যাপার? তোমরা বেড়াতে না গিয়ে··· ?

কুড়ি

"মানে, আপনাদের সঙ্গে আমাদের অনেক কথা ছিল যে মা।"

বালিশটা সরিয়ে দিয়ে ব্রজেনবাবু বলে উঠলেন, "বসে পর বসে পর তোরা। মায়া যে কি? শত প্রশ্ন—কি? কেন?"

দু'জনে বসে পড়ল বটে, কিন্তু কি করে, কে প্রথম আরম্ভ করবে, তাই যেন ঠিক করতে পারছিল না। ঊর্মি শুরু করল, 'বলছিলাম কি, অনুপরা যখন এখানে আছে, আমাদের বিয়েটা শিগ্‌গির হলেই ভাল হয়।"

"ঠিক বলেছিস্। বড় বুদ্ধির কথা বলেছিস্। মল্লি আছে, ইন্দ্রজিৎ আছে। সব ব্যবস্থা ওরাই করবে বলেছিল। ওদের বাড়ীতে হবে।"

একটু চুপ করে থেকে শম্ভু বলতে আরম্ভ করল, "মা, বাবা-

দু'জনকেই আমি একটা কথা বলতে চাই। বিয়ের পর থেকে আমরাই থাকব আপনাদের কাছে, মানে টিভোলি কোর্টের ফ্ল্যাট হবে আপনাদের, আর আপনাদের ছেলে-মেয়ে, আপনাদের স্নেহের ছায়ায় থাকব।"

"হঁ। বাবা, মাকেও বলছি, আমি বড় মুখ করে শম্ভুকে বলেছি, তোমাদের পদবীর বোঝা দুই ছেলে বয়ে বেড়াক, তাতে ভাগ আমি নেব না। কিন্তু মা-বাবা থাকবে আমার কাছে, সেখানে কারও ভাগ বসান চলবে না। তোমরা যদি এতে রাজি না থাক, তবে আমি কিন্তু বিয়ে স্থগিত করে দেব।"

"আমি ওর সঙ্গে একমত। আপনাদের স্নেহ মমতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

ওরা তাকিয়ে দেখল, মার চোখে জল। মায়াদেবী এগিয়ে এসে শম্ভুনাথকে কাছে টেনে নিলেন, "আজ অধিপ আমাকে ছেড়ে গেছে, কিন্তু তুমি এলে সেই জায়গাতে। শম্ভু তুমি আমার ছেলেরও বাড়া। ওদের করেছি। বড়র কাছে পাইনি কিছু ; ছোট অবশ্য করে। তুমি সবার ওপরে কিছু না পেয়ে দিচ্ছ। তোমাকে না ভালবেসে কি থাকতে পারি? অনেক দিন থেকেই যে তোমাকে ভালবাসি। এমন ছেলের মা হওয়া ভাগ্যের কথা। ঊর্মির কাছে থেকেছি এতদিন, বলতে গেলে আমার কাছেই যেন ও থেকেছে।"

"এখন থেকে আপনার কাছে একজন না থেকে দু'জন থাকবে।"

"তাই হবে বাবা, তাই হবে," ব্রজেনবাবু একটা হাত রাখলেন ঊর্মির কাঁধের উপর।

ফোন বেজে উঠল। মিঃ রায় বেরিয়ে গেলেন ফোন ধরতে। এ ঘরে তিনজনে বিয়ের ব্যাপার নিয়ে অনেক শলা-পরামর্শ হয়ে গেল। ঊর্মি বুঝল, তার অজান্তে মল্লি অনেক কিছু প্ল্যানকরে ফেলেছে।

"মল্লি বলছিল, ওরা দু'জনে হাজার পঁচিশ টাকা তোর বিয়ের নাম করে আলাদা করে রেখেছে। শুধু গয়নার জন্য। আমি বললাম, পেনসনের সব টাকা জমিয়ে কয়েক হাজার টাকা হয়েছে—তাতে খাওয়া ও কাপড় ইত্যাদি হবে। ফার্নিচার?"

বাধা দিয়ে উর্মি বলল, "ফার্নিচার ত কোম্পানী দেবে। আর, জান মা, শম্ভু এর চেয়ে বড় ফ্ল্যাটের জন্য য়্যাপ্লাই করেছে।"

ঠিক সেই সময় অস্থির হয়ে ব্রজেনবাবু এসে দাঁড়ালেন।

"কি হয়েছে? তোমার চেহারা এরকম দেখাচ্ছে কেন?" মায়াদেবী উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠলেন।

"বাণী ফোন করেছিল।"

"ও ভাল আছে ত?"

"ভাল ত আছে। কিন্তু···", একটু থামলেন। "এখনই আসছে। তখনই সব জানতে পারবে। আমার শরীরটা যেন কেমন করছে। আমি বসবার ঘরে যাই।"

না থেমে উনি চলে গেলেন। শম্ভু কিছু না বলে ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে গেল।

"তোর বাবা কেন এমন করছে? বাণীই বা কি বলতে আসছে?"

উর্মি বুঝেছে, বনানী তার মাকে বলেছে। আহা বেচারা মাসী। মল্লিকে আগে বললেই বোধ হয় ভাল হোত। বড় ভুল হয়ে গেল। মার দিকে তাকিয়ে উর্মি ভাবল, এখনই মাকে বলাটা দরকার। বাবাকে সামলান দরকার। বড় আঘাত পেয়েছে, হার্ট দুর্বল। মাই পারবে সেটা।

এগিয়ে এসে বলল, "মা, তোমাকে এখন যে কথা বলব, তা শত কঠিন হলেও তোমার সহ্য করতে হবে। বাবার দিকে তাকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে।"

"যা বলবার বল, তাড়াতাড়ি। আমার ভেতরটা যেন কেমন করছে।"

"স্থির মনে শোন। অনেক আঘাত পেয়েছ। এতদিনে সহ্য করবার ক্ষমতা তোমার হয়েছে, আমি জানি। অনুপরা শিগগীরি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে।"

"কি বলছিস্? সেখানকার বাসিন্দা হবে?" গলা চিরে যেন কথাটা বেরিয়ে এলো।

"না, না। তা কেন হবে। পাঁচ বছরের জন্য যাচ্ছে বদলী হয়ে। এর মধ্যে একবার এসেও যাবে।"

মায়াদেবী. মনে হল, নিজেকে সামলে নিলেন। বোধ হয়, মেয়ের দিকে তাকিয়ে, স্বামীর কথা ভেবে। আর শম্ভু, যে ছেলে তার জীবনে প্রদীপের আলো ধরল, সে কি ফেল্‌না ?

"এত দুঃখের কথা হলেও তেমন কিছু নয়। কয়েক বছর পরে ত ফিরে আসবে। আজকের মত দিনে যদি আমরা দুঃখ পাই বা দুঃখ করি, তবে তিনি ত কোন দিন ক্ষমা করবেন না। আজ পাশে তুই আছিস্। শম্ভু আছে। আমাদের কিসের ভাবনা। ওরা ভাল হোক। আমি শুধু ভাবছি বাণীটার কথা। ওর জীবনটা বড় শূন্য হয়ে গেল।"

"আমিও তাই ভাবছি, মা। কোথায় তোমাদের দু'জনের বাণী-মাসীকে জোর দেওয়া দরকার, মা বাবা যেন কি ?"

"তুই ভাবিস না। শম্ভুকে ডাক। আমি ওকে বুঝিয়ে ঠিক করছি।"

বাইরে ট্যাক্সি থামার আওয়াজে ওরা বেরিয়ে এলো। দেখল বাণীদেবী নামছেন। এক দিনেই, মনে হচ্ছে, যেন কতটা বয়স বেড়ে গেছে।

উর্মির বড় মায়া হল। ও গিয়ে প্রণাম করতেই শম্ভু এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বাণীদেবীর জীবনে অনেক ঝড় এসেছে, কিন্তু এতটা ভেঙ্গে পড়তে কখনো কেউ দেখেনি।

বসে আস্তে আস্তে বললেন, "তোমরা সব শুনেছ ?"

উর্মি বলে উঠল, "সব শুনেছি আমরা। তোমার কি শুধু একটা মেয়ে মাসী ? আমি, মল্লি—আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি ? আমরা তো তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।"

"কি যে করছ বাণী ? ওরা ত যাচ্ছে মাত্র কয়েক বছরের জন্য। তারপর......"

ব্রজেনবাবুকে বাধা দিয়ে মিসেস গুপ্ত বলে উঠলেন, "তুমি তাই মনে কর, ব্রজেন ?"

"নিশ্চয়ই করি, একশ বার করি। একটা কথা আছে, জানত বাঙ্গালীর রক্তে চাকরীটাই আসল। তার উপর যদি সরকারী চাকরী হয়, কিছুতেই তারা চাকরী ছাড়তে পারে না। কথা আছে, গুলি করে মাব, কিন্তু চাকরী মেরো না।"

এই কথা শুনে বাণীদেবীর মুখের রং যেন একটু বদলাল। ফ্যাকাসে চেহারাতে যেন স্বাভাবিকের ছায়া পড়ল।

সত্যি স্বাভাবিক এই বদলানো।

সবই বদলাতে বাধ্য। সমাজ বদলাচ্ছে। সংসার বদলাচ্ছে। বাইরের হাওয়া পশ্চিমের প্রভাব বয়ে এনে এনে গোটা জীবনটাই ওলটপালট করে দিচ্ছে। তার স্রোতও আর এখন একটি মাত্র ধারায় বইছে না। শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আধুনিক জীবনের এই নিয়তি।

আধুনিক মন? সেও ত বদলিয়ে যাচ্ছে। চেনা যায় না এমনভাবে তার রঙ বদলাচ্ছে। জানা যায় না এমনভাবে তার ধরন বদলাচ্ছে। যতই আমরা বাঙ্গালী পরিবার, সংসার আর জীবনযাত্রাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই না কেন হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেছে তারা।

যে মন বদলায় না, সেই মায়ের মন? তাকেও সেই বদলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। তুমি যদি একা ঘরের কোণে নীরবে কাঁদ তুমি একলাই কাঁদবে। যদি বাইরে এসে হাস সবাই হাসবে তোমার সাথে সাথে। তাতেই পাবে তুমি মনকে সামলাবার সহায়তা।

ভাবতে ভাবতে বাণীদেবী একটু হাসলেন। ম্লান হাসি, তবু মন আর মলিন নয়।

একুশ

মল্লিদের বাড়ীতে বেজে উঠল শানাই। ভোর রাত থেকে সুরের মূর্চ্ছনায় সকলেই সুখ-স্মৃতিতে মন গেল ভরে। কার জীবনে সুদূর অতীতের এই দিনটির স্মৃতি বড় মধুর হয়ে এলো। হোক না অতীতের।

তাতে দুঃখ নেই। তা যে নানা ভাবে, বারে বারে দক্ষিণের দুয়ার নিয়ে এসে দেখ চুপি।

তাইত, তাইত ব্রজেনবাবু ও মায়াদেবীর মেয়ের বিয়ের দিনটার কথা মনে আসার আগে নিজেদের ফেলে আসা দিনটার কথা মনে এলো। অজান্তেই একই সঙ্গে দু'জনে তাকাল দু'জনের দিকে। ঠিক এই ভাবেই প্রতিটা ঘরেই সুরের রেশ পেল সে আভাস। শুধু সে ছাড়া বুঝি কেউ জানল না বুঝল না।

উর্মির চোখে ঘুম ছিল না। অনেক ভেবে, অনেক বুঝে সে এগিয়ে গিয়ে শম্ভুনাথের হাত ধরেছে। এতে তার কোন সংশয় নেই। সে যে চেনা, বড় জানা। বহু যুগের ওপার থেকে এত কাল পরে, এত প্রতীক্ষার পরে। প্রতীক্ষাই ত। মনের অজান্তে সে কি গোনেনি দিন? অপেক্ষা করে থাকেনি এই দিনটার জন্য? যে দিন মল্লি বলেছিল,—"তোকে কনের সাজে কি সুন্দর মানাবে। এমন ফিগার, এমন মিষ্টি মুখ। চোখের সামনে ভেসে উঠছে কুম্‌কুম্‌ আর চন্দনের সঙ্গে ফোঁটা সারা মুখে, চোখে কালো কাজলের সঙ্গে স্বপ্নের কাজল মেশানো। কথা দে উর্মি, সে দিন আমি সাজাব তোকে একা। আমাদের বাড়ীতে হবে। দেখিস, উনকোটি চৌষট্টি নিয়মের একটাও ভাঙ্গতে দেব না। বড় সাধ ছিল ছোট বোনটাকে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেব।"

"বেশ, কথা দিলাম মল্লি, যদি সে দিন আসে, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ কোরব। তবে হ্যাঁ," হেসে সে বলেছিল, "তোর আর ইন্দ্রজিতের দিনটা আমার আশ মিটিয়ে সব করব।"

মল্লি কথা রেখেছিল। উর্মির হাতেই যেন ছিল সব কিছুর চাবি-কাটি। উর্মির জীবনে সেই পরম দিনটা এসেছে কয়েক বছর বাদে। এবারে মল্লি তুলে নিয়েছে সব ভার, সব ভাবনা।

উর্মি শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, যখন হবার কেমন আয়েসে হয়। অবশ্য সবার জীবনে নয়। মল্লি আর ইন্দ্রজিতেরই সব দায়-দায়িত্ব। আর সবাই যেন নাইওর নাইওরী। এমন কি তার মা-বাবার-ভাই, সবারই শুধু আনন্দ করবার দিনই।

মল্লির বাড়ীতে এসে পড়েছে ওরা সকলে। বাণীমাসীও বাদ যাননি। মা অবশ্য চিঠি দিয়ে মাসীর বৌ জানকীকে আনিয়ে নিয়েছে। দধিমঙ্গল থেকে কোন কিছুই বাদ পড়েনি। মল্লি সাত বুড়ীর এক বুড়ী হয়ে সব করে বেড়াচ্ছে। উর্মি বা শম্ভুর মুখ খুলবার যোটি নেই। উর্মির ভাসুর, জা, ননদ, নন্দাই—সবার কাছে দু'জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জোড় হাতে। বাঙ্গালী সমাজের নিয়ম, কিছুই বাদ পড়েনি।

মল্লি বলেছিল, 'আমরা আমাদের ভালটা কেন ছাড়ব? তার সঙ্গে যোগ করব বাইরের ভালটা।"

আগের দিন হয়ে গেছে আশীর্বাদ ও রেজিস্ট্রেশন। এক এক করে সব কিছু হয়ে গেল নিখুঁতভাবে, নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়।

মিঃ ও মিসেস মল্লিক সেদিন সকালে এসে পৌঁছাল ভুবনেশ্বরের সেই বাড়ীতে, যেখানে কিছু দিন আগে এসেছিল ডঃ রায় ও মিঃ মল্লিক, আরও দু'জনে। সেই ডঃ উর্মিলা রায়ই আজকের মিসেস্ মল্লিক। মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে এসেছে দু'জনে। এখানে থাকার সময়ই দু'জনের মনের তারে একই ঝঙ্কার বেজেছিল 'আমি ভালবাসি তোমাকে।'

তাই, অন্য কোথাও না গিয়ে দু'জনে ঠিক করেছিল এইখানেই আসবে। ওরা আসার আগের দিন অনুপ ও বনানী চলে গেছে লক্ষ্ণৌতে। দিল্লীতে সুহাসদের ওখানে দু'এক দিন থেকে ওরা সোজা ফ্লাই করবে।

উর্মির ইচ্ছে ছিল না সবাইকে ফেলে চলে আসার। মল্লিই জোর করেছিল, "এমন দিন জীবনে একবারই আসে। ওকে হেলায় হারাসনি। সবাই ত আমাদের কাছেই আছে। তাছাড়া, দেখেছিস, মাসী-মেসো অনেক সহজভাবে নিয়েছেন। তার জন্য আসলে দায়ী কে জানিস? আমাদের শম্ভুনাথ। তুই ত আছিস। ওদের জন্য ভাববার কিছু নেই।"

"ঠিকই বলেছিস। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কষ্ট হচ্ছে বাণী মাসীর জন্য ওঁর শূন্যতা, মনে বড় ব্যথা দেয়।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঊর্মি বলেছিল, "সবই সয়ে যায়। সয়েও যাবে। প্রথম কিছুদিন আমাদের দু'জনকে সামলাতে হবে ভাগাভাগি করে। দিদিকে লিখেছি, স্কুল ছুটি হলে চলে আসতে সুহাসদাকে নিয়ে। সেই পর্যন্ত যেতে দেব না এখান থেকে। বাবা, তাই বলেছে।"

জানকী ও মালী ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। দু'জনে সোজা গিয়ে বসল ওদের ভাল লাগা বারান্দাটিতে।

আজকে জানকী এল না কি হবে জিজ্ঞাসা করতে। কোথায় কি রাখবে জানবার দরকার নেই মালীর। সবাই জানে। সবাই বোঝে, ওদের হৃদয় আজ গোপন রাগে রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সেখানে আর সবই অবান্তর। বাগানে ফুলগুলো যেন হাওয়ায় দুলে দুলে একই কথা বলতে চাইছে—তোমাদের এই রং যেন চিরদিনের জন্য মনের মধ্যে থাকে, থাকে কর্মের মধ্যে।

"ঊর্মি, বল, কিছু বল। চুপ করে থেকো না। দিনের পর দিন তুমি ছিলে আমার স্বপ্নের মধ্যে। ভেবেছি, স্বপনচারিণী থাকবে ভাবের মধ্যে। কিন্তু তোমাকে দেখে উঠেছিলাম চমকে, কি করে তুমি রক্তমাংসে গড়া হলে? তাও কি হতে পারে? তাইত এত সহজে তোমাকে পেরেছিলাম বুঝতে।"

ঊর্মি যেন কিছু বলতে পারছিল না। আনন্দে, তৃপ্তিতে চোখে জল ভরে এলো।

"আমার বলার কিছু নেই। আমার সব কিছু মিশে গেছে তোমার সঙ্গে প্রাণের মধ্যে শুধু একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। সবই ত নিলে। তোমাকে দূরে যেতে দিতে কোনদিন পারব না। নিজেও পারব না ছেড়ে যেতে। ক্ষণিকের বিচ্ছেদও ত সইবে না। এ যে বড় দায়।"

নিবিড় ভাবে দু'জনি দুজনকে জড়িয়ে ধরল; কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ এসে দিল ঢেকে দিবাকরের মুখ।

—